মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীদের পত্রিকা

নবীন

সপ্তদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

নবীন

সপ্তদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

সূ চি প ত্র

ভালো সময়, খারাপ সময় ২
আমি বীরাঙ্গনা বলছি : রক্তের অক্ষরে লেখা
স্বাধীনতার দলিল ৫
অসামান্য উদ্যোগ : দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ ৮
স্বপ্ন ছোঁয়ার হেমন্ত ১০
পাখির জন্য আলিদেওনা গ্রামবাসীদের
অন্যরকম ভালোবাসা ১১
অংকুর : নৈতিকতা উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা ১২
সমালোচনা হলো আয়নায় নিজেকে দেখার সুযোগ ১৫
ঝাঁপা গ্রামের ভাসমান সেতু
ঐক্যবদ্ধতাই যখন সমাধান ১৭
চলন বিলের চলন-বলন ১৯
গুপী গাইন বাঘা বাইন : নট আউট ফিফটি ২১
ট্রয় নগরী : শুধুই কি উপকথা নাকি ইতিহাস ২২
বিনামূল্যে উচ্চশিক্ষার জন্য
বিশ্বের সেরা ৮টি শিক্ষাবৃত্তি ২৪
বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক পরামর্শ ২৬
প্রকল্প/ফাউন্ডেশন সংবাদ ২৭
মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা
বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে ৩১
মাথায় কত প্রশ্ন আসে ৩২

সম্পাদক : তাসনিম হাসান হাই সহকারী সম্পাদক : মো. শাহরিয়ার পারভেজ

প্রকাশক : হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড, প্লট নং ২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক
শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : ৯১২১১৯০, ৯১২১১৯১, ০১৭২৭২০৯০৯৮। ই-মেইল : hdf.dhaka@gmail.com

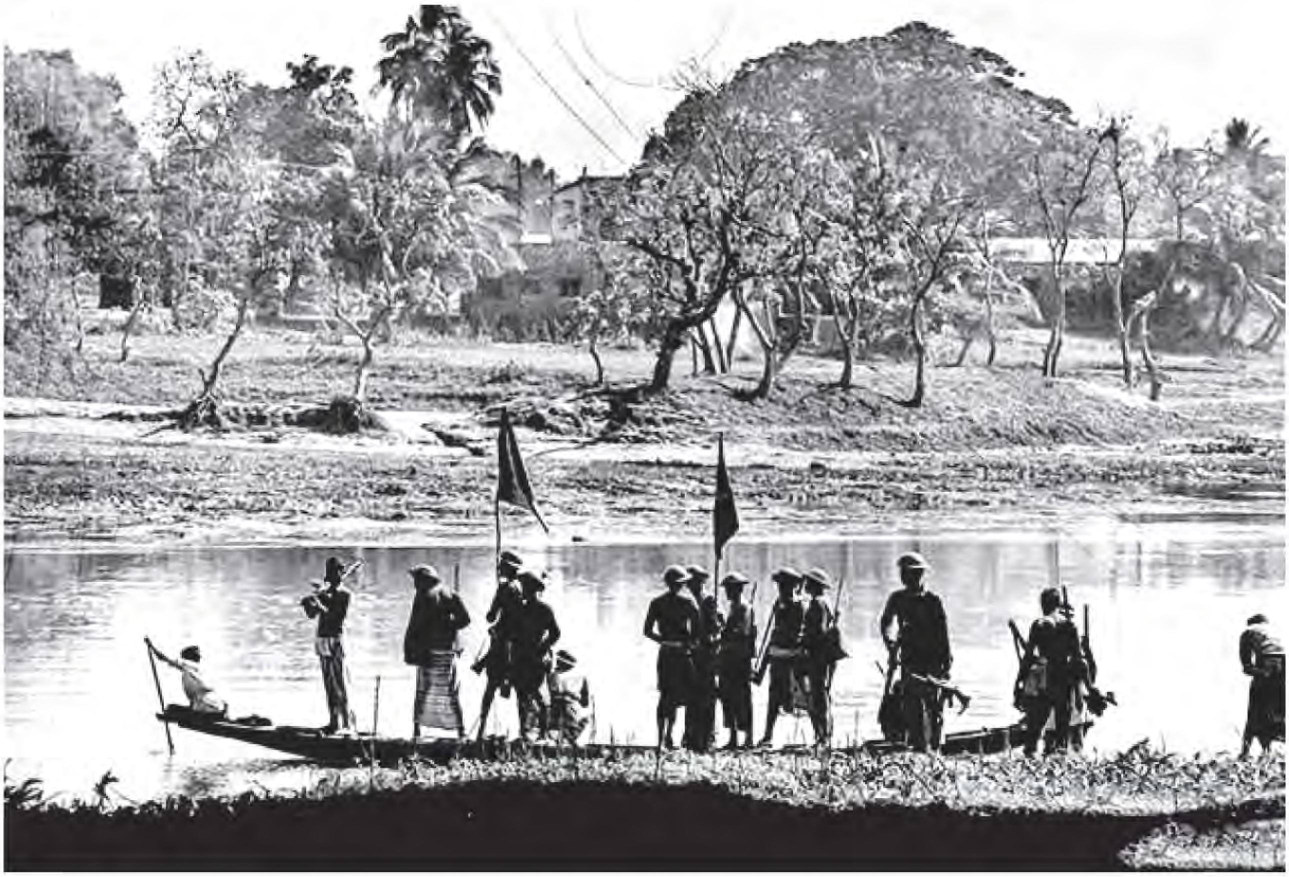

ভালো সময়, খারাপ সময়

খারাপ দিনের মিছিল শুরু হলো। সেই মিছিল যে কত অন্ধকার রাস্তা দিয়ে, নিকষ কালো সুড়ঙ্গ দিয়ে ভ্রান্ত দিকে, অচেনা দিগন্তে আমাদের নিয়ে গেল, তার হিসাব দেওয়াটাও কঠিন। তবে সেই অন্ধকারে মাসে মাসে আলো জ্বলল, শ্রেষ্ঠ সময়ের দাবিদার তরুণেরা ঝলসে উঠল। আমরা যে কঠিন তিমিরে তলিয়ে গেলাম না, তা এই তরুণদের জন্য।

বাংলাদেশ নিয়ে যাঁরা আশাবাদী, যাঁদের মধ্যে আমি নিজেকে সব সময় গণনায় রাখি, তাঁদের যদি কোনো মায়াবী সময়-ভ্রমণে ১৯৭১ সালের বিজয় দিবসে নিয়ে যাওয়া অথবা ফিরিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে একটা অদ্ভুত সময়ের মুখোমুখি তাঁরা হবেন, যাকে চার্লস ডিকেন্সের একটি উপন্যাসের বর্ণনাকারীর ভাষ্য অনুবাদ করে বলা যায়, 'এটি ছিল সবচেয়ে ভালো সময়, এটি ছিল সবচেয়ে খারাপ সময়।' দুই দশকের প্রস্তুতি নিয়ে, ৯ মাস যুদ্ধ করে দেশটা স্বাধীন হয়েছে, শীতের কুয়াশামাখা আকাশে উড়ছে সবুজ আর লাল পতাকা, উজ্জ্বল বাংলাদেশের মানচিত্রটাও আছে সেই পতাকায়। আজকাল একটা বড় কোনো খেলায় বাংলাদেশ জিতলে তরুণেরা উদ্বেলিত হয়ে পতাকা হাতে উদ্‌যাপনে নেমে পড়ে। সেই বিজয়ের দিনে যে আনন্দ আমাদের উদ্বেলিত করেছিল, সে ছিল একটি জাতির জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জনের। স্বাধীনতা থেকে বড় অর্জন আর নেই, স্বাধীনতা উপভোগ করার আনন্দের থেকে বড় আনন্দ আর কিছু নেই। আজকের তরুণেরা সে আনন্দটা শুধু অনুমানই করতে পারবে, এটি নিজেদের ভেতর জাগানোটা তাদের জন্য কঠিন। তাদের অভিজ্ঞতায় এর তুল্য কিছু যেহেতু নেই।

স্বাধীনতার জন্য অবশ্য আমাদের চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। লাখ লাখ প্রাণ, শূন্য বুকের চিরস্থায়ী বেদনা, সম্ভ্রম হারানোর ট্রমা। আনন্দের সঙ্গে মিশে গেছে কান্না আর হাহাকার। উদ্‌যাপনের প্রথম ঢেউটি কূলে পৌঁছে গেলে যে কিছুটা সময় পাওয়া গেছে

সুস্থির চিন্তার, সেটি গেছে সেই কান্না আর বেদনা সামাল দিতে। এবং এই সত্য মেনে নিতে যে এই দেশে জন্ম নেওয়া, এর জল-হাওয়ায় বড় হওয়া কিছু মানুষ শত্রুদের সাহায্য করেছে আমাদের হত্যা করতে, বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতে। তারা ঘরে ঘরে নিয়ে গেছে খাকি পোশাক পরা খুনি আর ধর্ষকদের। নিজেরাও এই অপকর্মে মেতেছে। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য।

সবচেয়ে খারাপ সময় বটে।

সেই সময়টাকে মেরামত করতে, সবচেয়ে ভালো সময়টাকে চিরস্থায়ী করতে আমরা কাজে নামলাম বটে, কিন্তু দেখা গেল চারদিকে শুধুই দেয়াল, শুধুই বাধা। একটা ভেঙে পড়া নগরকে বাসযোগ্য লোকালয়ে পরিণত করার জন্য অর্থ লাগে, বিনিয়োগ লাগে, সামগ্রী লাগে। এসবের কোনোটি না থাকলে একটা জাদুর চেরাগ অন্তত লাগে। আমাদের কিছুই ছিল না। তারপরও আমাদের যাত্রাটা শূন্য থেকে বিয়োগের দিকে যায়নি, যোগের দিকেই চলেছে। ধীরে ধীরে প্রাণটা জেগেছে। শরীরে বল এসেছে, ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে একটা নতুন নির্মাণের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। দেশটাকে তলাহীন ঝুড়ি বলে বিদ্রূপ করেছেন পরাশক্তির এক মোড়ল। কিন্তু ঝুড়িটার তলার মেরামতি হয়েছে। ঝুড়ি ভরে ধান তোলার দিনের দিকে যখন যাচ্ছে দেশ, এর স্থপতিকে মেরে ফেলা হলো। তাঁর অরক্ষিত বাড়িতে তাঁকে হত্যা করতে যত সেনাসামন্ত পাঠানো হলো, তা দিয়ে একটা শত্রু শহরের দখল নেওয়া যায়। এবং যারা তাঁকে মারল, তাদের সহানুভূতি ছিল একাত্তরের সেই মানুষগুলোর জন্য, যারা শত্রুকে প্রভুর স্থান দিয়ে সেবা করে গেছে। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য।

সবচেয়ে খারাপ দিনই বটে।

খারাপ দিনের মিছিল শুরু হলো। সেই মিছিল যে কত অন্ধকার রাস্তা দিয়ে, নিকষ কালো সুড়ঙ্গ দিয়ে ভ্রান্ত দিকে, অচেনা দিগন্তে আমাদের নিয়ে গেল, তার হিসাব দেওয়াটাও কঠিন। তবে সেই অন্ধকারে মাসে মাসে আলো জ্বলল, শ্রেষ্ঠ সময়ের দাবিদার তরুণেরা ঝলসে উঠল। আমরা যে কঠিন তিমিরে তলিয়ে গেলাম না, তা এই তরুণদের জন্য।

একসময় গণতন্ত্র মুক্তি পেল। স্বৈরতন্ত্র নিপাত গেল। নূর হোসেনের মতো আলো ঝলসানো তরুণদের আত্মত্যাগ সময়টাকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনল, কিন্তু ভালো সময় কি ফিরল? অবিরাম হলো তার চলা?

না, তা হয়নি, এবং কেন হয়নি, তা মায়াবী ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত করে আমাদের সময়ে ফিরে এসে, আমরা অনুভব করি। এক রাজনীতিবিদ, পরিবহন ক্ষেত্রের ওজনদার এক নেতাও তিনি, হঠাৎ নূর হোসেন সম্বন্ধে অকারণ বিষোদ্গার করে বসলেন। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। তিনি প্রমাণ করলেন, নূর হোসেন ও তাঁর মতো তরুণদের জন্য ক্ষমতা হারিয়ে আবার ক্ষমতায় এসেও তিনি (এবং তাঁর মতো অনেক রাজনীতিবিদ) ভালো-মন্দের পার্থক্যটা বুঝতে পারেন না। কেন সময় ভালো হয়নি, সবচেয়ে ভালো হওয়া তো দূরের কথা, তার একটি কারণ আমাদের রাজনীতি। এই রাজনীতিতে মূল্যবোধের জায়গা নেই, এই রাজনীতি ক্ষমতায় যাওয়ার এবং একবার গেলে, স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার। এই রাজনীতি গণমুখী নয়, সেবাধর্মী নয়, ত্যাগের নয়–এ রাজনীতি দল ও ব্যক্তিমুখী, শক্তি প্রদর্শনের এবং ভোগের। এ রাজনীতি যে অর্থনীতিকে লালন করে, তা পুঁজিনির্ভর, সে অর্থনীতি শোষণ এবং শোষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তি জোগানোর। এই অর্থনীতি কলকারখানা তৈরিতে অর্থ জোগায়, যোগাযোগে, মেগা প্রকল্পে বিনিয়োগ করে। এতে ধনীর সংখ্যা বাড়ে, তারা টাকার পাহাড় গড়ে, বিদেশের ব্যাংক ভরে দেয় দেশ থেকে পাচার করা টাকায়। কিন্তু শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দিতে এক শ রকমের আপত্তি তোলে। এদের অনেকে ব্যাংক লুট করে, কেউ কেউ মাদকের ব্যবসায় নামে। বাংলাদেশে ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার এখন এই উপমহাদেশের সব দেশের মধ্যে বেশি। ধনীরা এখন আর এক শ-দুই শ কোটিতে সম্পদ মাপে না, এখন তাদের পাল্লার বাটখারা শুরুই হয় হাজার কোটি দিয়ে। এই টাকা দিয়ে কেউ কেউ সংসদের আসন জোগাড় করে, মিডিয়ার আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক হয়। লোভের এবং লাভের পাল্লায় ফেলে সবকিছু মাপলে যা হয়, দুর্নীতি বাড়ে। বাংলাদেশে এখন শস্যের চেয়ে বেশি ফলে দুর্নীতি।

ধনী যত ধনী হয়, গরিব তত গরিব হয়, বাংলাদেশের উন্নয়ন অবশ্যই হয়েছে, অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এবার ৮ দশমিক ১৫ শতাংশে পৌঁছেছে। শহরগুলো চকচকে হয়েছে। রাস্তা হচ্ছে, পদ্মা সেতু হচ্ছে। পায়রা বন্দর হচ্ছে। এই উন্নয়নের যাঁরা কারিগর, যাঁরা এটি নিশ্চিত করেছেন, তাঁরা অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদ এবং প্রশংসা পাবেন। কিন্তু উন্নয়নের সঙ্গে যে দারিদ্র্য বেড়েছে, বৈষম্য বেড়েছে, তার নিরসন কীভাবে হবে? বাংলাদেশ এখনো যে বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে 'তীব্র ক্ষুধার' দেশের কাতারে, তার কী হবে?

২.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন দেশের সংবিধান রচনার কাজটি শুরু করলেন, তাঁর সারা জীবনের রাজনীতির অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি তা করতে চাইলেন। তিনি বুঝেছিলেন, সমাজতন্ত্রের পথে অর্থনীতির চলা উচিত, যেমন গণতন্ত্রের পথে সরকারের ও রাষ্ট্রের এবং অসাম্প্রদায়িক পথে রাষ্ট্রের ও সমাজের। এসব অনুধাবন স্থান পেল সংবিধানে সন্নিবেশিত চার মূলনীতিতে। যদি নীতিগুলো বাস্তবায়ন শুরু হতো, তাহলে এই সময়ে এসে আমরা বলতে পারতাম, একাত্তরে আমরা যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, দেশ নিয়ে যা চেয়েছিলাম, যে পরিবর্তন, নতুন চিন্তা, নতুন নির্মাণ প্রত্যাশা করেছিলাম, সেসব অর্জন করার পথে আমরা আছি। এবং তা যদি ক্রমাগত করা যেত, তাহলে সবচেয়ে ভালো সময়টাতে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে পারতাম।

আবারও বলি, এই ৪৮ বছরে আমরা অর্জন কম করিনি–শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি–এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে আমাদের দৃশ্যমান উন্নতি হয়নি। এবং এই উন্নতির একটি বড় কৃতিত্ব আজকের সরকার দাবি করতেই পারে। কিন্তু উন্নতি–অথবা উন্নয়ন–তখনই অর্থবহ হয়, যখন দেশের সব মানুষ তার সুফল পায়, কেউ দরজার বাইরে থাকে না, কেউ বঞ্চিত হয় না। আর উন্নয়নকে শুধু অর্থনীতি বা পরিসংখ্যানের ফিতা দিয়ে মাপলে তো হয় না, উন্নয়ন হতে হয় নৈতিকতায়, শৃঙ্খলা ও আইনমনস্কতায়, সামাজিক আচারে, শিক্ষায় ও শিক্ষার সংস্কৃতিতে, মানবিকতা ও মূল্যবোধে, পরিবেশচিন্তায়। আরও কত ক্ষেত্রে। উন্নয়নের পরিসংখ্যানে কি পথশিশুরা জায়গা পায়, বয়স্ক, নারী এবং প্রতিবন্ধীরা গণ্য হন?

উন্নয়ন কি নারীর সুরক্ষা ও সক্ষমতায়নকে গণনা করে? অথবা সুবিধাবঞ্চিত, নিপীড়িত পাহাড়ি জনগোষ্ঠী এবং আদিবাসীরা, প্রান্তে অবস্থান করা সংখ্যালঘুরা?

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং কারাগারের রোজনামচায় তাঁর দেশ ও রাজনীতিচিন্তা, সমাজ ও নানা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, এবং দরিদ্রদের সেবা ও সুরক্ষা নিয়ে তাঁর চিন্তাগুলো তিনি তুলে ধরেছেন। বঙ্গবন্ধু একটি কল্যাণরাষ্ট্র চেয়েছিলেন, এবং একটি সুষম ও বৈষম্যহীন অর্থনীতি। তাঁর প্রস্তাবিত ছয় দফাতে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এবং দিকনির্দেশনা আছে। তিনি গণতন্ত্র চেয়েছিলেন, যে গণতন্ত্রে মূল দৃষ্টি থাকবে মানুষের দিকে, যেখানে বিরোধীকণ্ঠ স্তব্ধ হবে না, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও থাকবে অবারিত। তিনি ধনীর শোষণকে শ্রমিক-কৃষকের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ভাবতেন, স্বার্থপরতাকে একটি রোগ হিসেবে দেখতেন, ভোগের চেয়ে ত্যাগকে ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, রাজনীতিতে তেমন একটি অনিবার্য শর্ত হিসেবে দেখতেন। তিনি তো তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এক-তৃতীয়াংশের বেশি সময় কাটিয়েছেন কারাগারে। একবার মুক্তি পেয়ে কারাফটক থেকে আরেক মামলায় ফের কারাগারে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। তিনি তো ভেঙে পড়েননি। নিয়মতান্ত্রিকভাবেই তিনি সংগ্রাম করেছেন। লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন। মানুষ তাঁর সঙ্গে ছিল বলে তিনি তাঁর সেই লক্ষ্যে পৌঁছেছেন।

কেন সবচেয়ে ভালো সময়ের দেখা আমরা এখনো পাইনি, তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সরকারগুলোর দিকে, রাজনীতির দিকে আমরা অভিযোগের আঙুল তুলি। এই আঙুল আমাদের নিজেদের দিকেও তো তুলতে হয়। আমরাও তো দুর্নীতি আর নানা অপচর্চাকে প্রতিদিনের আচরণে জায়গা করে দিয়েছি। যে মানুষ দুর্নীতির স্বাক্ষর রাখেন, সব কাজে, পরিবার থেকে কি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ হয়, নাকি তিনি সমর্থন পান, যেহেতু তাঁর কাজে পরিবারের সম্পদ আর বিলাস বাড়ে?

একাত্তরে আমরা যে বাংলাদেশ চেয়েছিলাম, আজকের বাংলাদেশ যে তা নয়, আমাদের চারদিকে একবার চোখ বোলালে তা দেখতে পাই। কেন সেই বাংলাদেশ আমরা পাইনি, তার একটা ব্যাখ্যা ওপরে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এখন যদি আরও কিছু কারণ তুলে ধরতে হয়, বলা যায়, একটা দেশে গরিব মানুষ ন্যায়বিচার না পেলে, রাজনীতি বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত করলে সমাজ স্থবির হয়ে পড়ে। আরও বলা যায়, প্রশাসনও এখন রাজনীতির দখলে, ফলে প্রশাসনে জবাবদিহির ও স্বচ্ছতার অভাব। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর হয়ে পড়লে শুদ্ধাচার ও সুনীতিচর্চা কীভাবে বাড়ে? নির্বাচন কমিশন থেকে নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন–সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই নানা অভিযোগ ওঠে। জাতীয় সংসদে কোনো কার্যকর বিতর্ক হয় না। নির্বাচনেও স্বচ্ছতা নেই। এই সব অস্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচারের অভাব তো চলছে সরকারের পর সরকারের আমল ধরে। এখনো ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হয়, উগ্রপন্থার বিস্তার হয়। শুধু বিকাশ হয় না সুনীতির আর নৈতিকতার।

কেন সবচেয়ে ভালো সময়ের দেখা আমরা এখনো পাইনি, তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সরকারগুলোর দিকে, রাজনীতির দিকে আমরা অভিযোগের আঙুল তুলি। এই আঙুল আমাদের নিজেদের দিকেও তো তুলতে হয়। আমরাও তো দুর্নীতি আর নানা অপচর্চাকে প্রতিদিনের আচরণে জায়গা করে দিয়েছি। যে মানুষ দুর্নীতির স্বাক্ষর রাখেন, সব কাজে, পরিবার থেকে কি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ হয়, নাকি তিনি সমর্থন পান, যেহেতু তাঁর কাজে পরিবারের সম্পদ আর বিলাস বাড়ে?

সবচেয়ে খারাপ সময় নিশ্চিত করতে হলে আমাদের সবাইকে বদলাতে হবে।

৩.

১৯৭০-এর নির্বাচনে, ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। এই বিনিয়োগ যে জিডিপির অন্তত ৪ শতাংশ হওয়া উচিত, তিনি তা-ও বলেছেন। আমরা শিক্ষা থেকেই শুরু করতে পারি আমাদের বদলানোর উদ্যোগ। শিক্ষাকে, যাকে বলে ঢেলে সাজাতে হবে, শিক্ষাকে সবচেয়ে বড় মেগা প্রকল্প হিসেবে দেখতে হবে। একইসঙ্গে সংস্কৃতিকে সতেজ করতে হবে। দুই বড় মেগা প্রকল্প, দুই বড় উদ্যোগ। কিন্তু শুরু করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা পারে একটি শিশুকে জীবনের জন্য তৈরি করে দিতে, তাকে আলোর পথটা দেখিয়ে দিতে। এখন যে শিক্ষা তারা পাচ্ছে, যে পদ্ধতিতে, যে পরিবেশে, এই কাজটি তা করতে পারবে না। সংস্কৃতি পারে ওই শিশুর ভেতর নৈতিকতা আর মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে। এ দুই সাফল্য যদি আমরা আগামী ১০ বছরে অর্জন করতে পারি (এবং একজন শিক্ষক হিসেবে আমার বিশ্বাস, যদি রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক পর্যায় থেকে নিয়ে ব্যক্তিপর্যায়ের সদিচ্ছা একত্র হয়, সেটি সম্ভব), তাহলে আগামী বছর তার পরের বছর সবচেয়ে ভালো সময়টি উদয় না হলেও ১০ বছর পরে হবে।

দুটি সমন্বিত, আন্তরিক উদ্যোগ; দীর্ঘমেয়াদি, ঐকান্তিক উদ্যোগ, কিন্তু তাদের অভিঘাত বিশাল। এই দুই উদ্যোগ আমরা অবশ্যই নিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক লেখায় লিখেছিলেন, আমাদের পিপাসা আছে, পানীয় জলও আছে, কিন্তু আমরা পিপাসা মেটাতে ব্যর্থ। এবং তা দেখে দুনিয়া হাসে।

এই বিজয় দিবস থেকে শুরু হোক পিপাসা আর পানিকে মেলানোর আমাদের চেষ্টা।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
কথাসাহিত্যিক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক
দৈনিক প্রথম আলো ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯

আমি বীরাঙ্গনা বলছি
রক্তের অক্ষরে লেখা স্বাধীনতার দলিল

বীরাঙ্গনাদের এ মাটি যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি। তাদের যোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে বীরের মালা ও মুকুট পরাতে পারেনি, বরং অপমানের কালিতে কলঙ্কিত করেছে। বীরাঙ্গনাদের নিয়ে লিখতে লেখকও ভয় পান পাছে সম্মানিত করার বদলে অপমানিত হয়ে যায়। এই মূর্খ, হীন সমাজ আর দেশে আমাদের বাস! 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থে আছে সাত বীরাঙ্গনার আত্মকাহিনি। এই কাহিনি শুধু সাতজনের নয় অসংখ্য বীরাঙ্গনার। যারা বীর কিন্তু মুখ লুকিয়ে চলেছে আর গোপন করেছে তার অংহকারের ইতিহাস।

আমার পরিচয়? না, দেবার মতো আমার কোনও পরিচয় আজ আর অবশিষ্ট নেই। পাড়ার ছেলে মেয়েরা আদর করে ডাকে ফতি পাগলী। সত্যি কথা বলতে কি আমি কিন্তু পাগল নই। যারা আমাকে পাগল বলে আসলে তারাই পাগল। এ সত্যি কথাটা ওরা জানে না। (আমি বীরাঙ্গনা বলছি–ছয়)

নীলিমা ইব্রাহিমের অমর সৃষ্টি 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' বইয়ের ষষ্ঠ কাহিনীর শুরুটা হয়েছে এভাবেই। বাংলার স্বাধীনতা আর বিজয় দিবসের আনন্দে মিশে আছে এসব নারীর আত্মত্যাগ। বিজয়ের পরে বঙ্গবন্ধু এই ত্যাগকে মহিমান্বিত করেছিল 'বীরাঙ্গনা' বলে। এ উদ্যোগ ছিল মহান। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য সেইসব বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা তো পানইনি বরং কারো কারো জায়গাই হয়নি এ মাটিতে, আর কারো কারো পরিণতি ফাতেমার মতো ফতি পাগলী হয়েছে। এই ফাতেমা আর দশটা সুস্থ মানুষের মতোই ছিল কিন্তু যুদ্ধ তাকে পাগলী নাম দিয়েছে। যুদ্ধ কেড়ে নিয়েছে তার স্বাভাবিক জীবন যার বর্ণনা আমরা পাই লেখকের ভাষায়–

১৯৭৩ সালে আমি দৌলতপুর গেছি। দৌলতপুর কলেজে আমার কয়েকজন ছাত্র ছিল। ইচ্ছা ওদের একটু খোঁজ নেয়া, কে কেমন আছে, দেশের খবর নেয়া ইত্যাদি। দেখলাম এক মহিলা কলেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি চাও তুমি? রক্তচোখ মেলে বলল, কলেজে পড়ব। বুঝলাম মেয়েটি স্বাভাবিক নয়। বললাম, তোমার নাম কি? নাম? ফতি পাগলী, হয়েছে। এবার যান। একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করায় বললো, উনি একজন বীরাঙ্গনা। (আমি বীরাঙ্গনা বলছি–ছয়)

ফাতেমার মতো আরও অনেক অসংখ্য নারীর স্বাভাবিক জীবন কেড়ে নিয়েছিল

যুদ্ধ। তারা শিকার হয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের। যে নির্যাতন ছিল অবর্ণনীয়। পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতনের শিকার এসব নারীদের রাখা হতো অন্ধকার বাংকারে। তাদের জীবনের কোনো মূল্য ছিল, তারা যে মানুষ এই বোধটুকুও ছিল না পশুদের কাছে। অন্তঃসত্ত্বা বা অসুস্থ হলে মেরে ফেলা হতো, কিল চড় লাথি ছিল তাদের প্রতিদিনের পাওনা। তাদের চামড়ায় ছিল ক্ষত। মাথার চুলে এবং ত্বকে হয়েছিল উকুন। বীরাঙ্গনাদের নিজস্ব বয়ানে প্রকাশিত সেই নির্যাতন 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থে উঠে এসেছে ভয়াবহ ছবি হয়ে–

শুরু হলো অত্যাচারের পালা। শকুন যেমন করে মৃত পশুকে ঠুকরে ঠুকরে খায় তেমনি, কিবা রাত্রি কিবা দিন আমরা ওই অন্ধকার দোজখে পচতে লাগলাম। মাঝে মাঝে তারা ওপরে ডাকতো আমাদের। আমরা গোসল করতাম, কাপড় বদলাতাম তারপর আবার অন্ধকূপে। কারা আমাদের ওপর অত্যাচার করত, তারা বাঙালি না বিহারি, পাঞ্জাবি না পাঠান কিছুই বলতে পারব না। (আমি বীরাঙ্গনা বলছি–সাত)

কোনো কোনো দিন খাবার আসত, কোনোদিন না। অনেক সময় পানিও থাকত না। হঠাৎ করে একদিন এসে সবার জামা কাপড়, যদিও সেগুলো শতছিন্ন এবং ময়লায় গায়ের সঙ্গে এঁটে গিয়েছিল তা টেনে হেঁচড়ে খুলে নিয়ে গেল। সম্পূর্ণ নগ্ন আমরা। কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছি না। দিনের বেলা ব্যাংকারে ঢোকার পথ দিয়ে কিছু আলো আসে। আমার মনে পড়ে তখন শীতের দিন ছিল। অপর্যাপ্ত কম্বল থাকায় এক কম্বলের নিচে দুতিনজন জড়ো হয়ে থাকতাম। কিন্তু রাতের সাথীরা যেন এখন বন্যপশুর আচরণ করছে। (আমি বীরাঙ্গনা বলছি–চার)

পরদিন হঠাৎ ওদের ভেতর একটি মেয়ে মারা যায়। অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সকাল থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।... মেয়েটার নাম ছিল ময়না। বছর পনেরো বয়স হবে।...কাঁটা পাঁঠার মতো হাত-পা ছুড়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল, মুখ খানা নীল হলো। (আমি বীরাঙ্গনা বলছি-এক)

অকথ্য নির্যাতনের শিকার এসব নারী যেমন লাঞ্ছিত আর নিপীড়িত হয়েছিল পাকিস্তানী বর্বর হানাদার বাহিনী দ্বারা। তেমনি লাঞ্ছিত আর নিগৃহীত হয়েছিল এই সমাজ, এই দেশ আর তার প্রিয়জনের কাছ থেকে। হানাদার বাহিনীর অত্যাচার ছিল নির্মম, অমানবিক, অসহনীয় আর চরম অবমাননার কিন্তু তার চাইতে দুঃসহনীয় আর অপমানের ছিল প্রিয়জনের অবহেলা। যুদ্ধ তাদের ইজ্জত কেড়ে নিয়েছিল কিন্তু তাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছা কেরে নিতে পারেনি, কেড়ে নেয়নি স্বাধীন বাংলাদেশ দেখার স্বপ্নকে। তাদের বাঁচার ইচ্ছা ফুরিয়ে গিয়েছিল সেদিন যেদিন সমাজ তাদের থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, যেদিন প্রিয় পরিবারে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল, ঘরে ফেরার দরজা যেদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বীরাঙ্গনা পুনর্বাসন কেন্দ্রই হয়ে উঠেছিল তাদের আশ্রয়, সেদিন ভাই বোনকে বলতে পেরেছিল–

তারা, আমরা যে যখন পারব তোর সঙ্গে দেখা করে যাব। তুই কিন্তু আবার হুট করে বাড়ি গিয়ে উঠিস না।... তা ছাড়া আমাদের ঠিকানায় চিঠিপত্র লিখবারও দরকার নেই। তুই তো ভালোই আছিস। (আমি বীরাঙ্গনা বলছি–এক)

সেদিনই মরে গিয়েছিল তারা ব্যানার্জী, এ মাটিকে প্রণাম জানিয়ে পোলিস মহিলা ডাক্তারের সহায়তায় নার্সিং শেখার বৃত্তি নিয়ে চলে গিয়েছিল পোল্যান্ড। তারপরের কাহিনি সাফল্যগাথার। তারা ব্যানার্জী বিয়ে করে ডেনমার্কের সাংবাদিক নিয়েলসনকে। আবার যখন দেখা হয় পরিবারের সাথে তখন হতভাগনী তারা ব্যানার্জী গর্বিত মিসেস টি নিয়েলসন। তারা ব্যানর্জীর পরিবার তখন বীরাঙ্গনার ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে সচ্ছল, স্থিতু সুখী পরিবার। সব কিছুর পর আমরা মুখোমুখি তারা ব্যানার্জীর তীক্ষ্ণ প্রশ্নের–

আপা দেশ স্বাধীন হয়েছে, কেউ গাজী-কেউ শহীদ। কেউ বীরউত্তম, বীরশ্রেষ্ঠ, কেউ মন্ত্রী, কেউ রাষ্ট্রদূত সবার কতো সম্মান সুখ্যাতি। আর আমি? আমি কিছু চাইনি, চেয়েছিলাম শুধু আমার নারীত্বের মর্যাদা আর প্রিয় জন্মভূমির বুকে আশ্রয়। স্বদেশে আমার সত্যিকার পরিচয় নেই, তারা ব্যানার্জী মরে গেছে। সেখানে সেদিন সম্মান মর্যাদা সবই পেল মিসেস টি. নিয়েলসেন আর টমাসের মা। আমি কোথায়? ওদের কাছে আমি ঘৃণ্য, নিন্দিত, মৃত। (আমি বীরাঙ্গনা বলছি–এক)

তারা ব্যানার্জী যখন মিসেস টি নোয়েলসন হয়ে বীরাঙ্গনার সাফল্য আর অহংকার নিয়ে বাংলার মাটি ছুঁয়ে আবার ডেনমার্কে ফিরে যায় তখনও কি শেষ হয় তার অভিমান, বুকের কান্না। না, শেষ হবার কথাও নয়। সে তো বীরাঙ্গনার অহংকার নিয়ে এ মাটি স্পর্শ করেনি, করেছে মিসেস টি নিয়েলসন হয়ে। সে তো হারিয়েছে তার বাঙালি পরিচয়, বাংলার মাটি। ডেনমার্কের নাগরিক টি নিয়েলসনের বুক বিদীর্ণ করা শেষ ইচ্ছা–

তোমাকে শেষ কথাটা বলে যাচ্ছি নীলা আপা, আমি নিয়েলকেও বলে রেখেছি আমার মৃত্যুর পর আমাকে কেউ বাংলাদেশে নেবার চেষ্টা করো না। জন্ম দিলে জননী হওয়া যায় কিন্তু লালন পালন না করলে মা হওয়া যায় না। আমি জন্মেছিলাম সোনার বাংলায়, লালিত হচ্ছি ডেনমার্কের কঠিন ভূমিতে। তবুও সেই মাটিতেই হবে আমার শেষ শয্যা। (আমি বীরাঙ্গনা বলছি–এক)

দেশমাতৃকার জন্য যে হারিয়েছে তাঁর ইজ্জত, অবর্ণনীয় নির্যাতন আর কষ্ট স্বীকার করেছে সেই মহান মুক্তিযোদ্ধার জায়গা হয়নি এই মাটিতে। এরকমই আরেক নারীর জীবনালেখ্য দেখি এ গ্রন্থে। যার কাহিনি আরও অনেক বেশি করুণ। দেশের জন্য যে নারী লাঞ্ছিতা সেই নারী বাবার বয়সী পাঠান শত্রুসেনাকে বিয়ে করে চলে যায় পাকিস্তান। যার নাম আমরা পাই মেহেরজান হিসেবে। এ নাম আসল নাম কি না জানা নেই আমাদের। প্রয়োজনও নেই জানার। আমরা জানি সে একজন বীরাঙ্গনা। সেও তাই জানে এবং গর্বের সাথে জানে এ মাটিতে মিশে আছে তার অবদান। এই গর্ব এই অহংকারের পরেও তার চোখে আমরা গর্ব আর অহংকারের জ্বলজ্বলে আলো দেখি না, দেখি অশ্রু আর গ্লানি। মেহেরজান নামক নারী সূচিকর্ম, কুটির শিল্পের উদ্যোক্তা আর কঠোর পরিশ্রমে পাকিস্তানের মাটিতে সফল নারী এবং পাঠান সন্তানের সফল মা হিসেবে নিজের জায়গা করে নেয়। কি পরিহাস! মাটির জন্য যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো, সেই যোদ্ধার আশ্রয় শত্রুর দেশের মাটিতে। বহু বছর পর

অসামান্য উদ্যোগ 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'

দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের পহেলা আগস্ট, রবিবার। প্রথমে বলা হয়েছিল; কনসার্ট হবে একটি। কিন্তু মানুষের চাপে শেষ পর্যন্ত দুপুর আড়াইটায় এবং রাত ৮টায় দুটি শো করতে বাধ্য হয়েছিলেন আয়োজকরা। একদিকে মানবতা; অন্যদিকে বিশ্বের তখনকার সংগীত মহাতারকারা জড়ো হয়েছিলেন এক ছাদের নিচে। পৃথিবীর মানুষ তাকিয়ে দেখেছিল, অনন্য মহিমায় কীভাবে একটি আবেগমাখা ইতিহাস রচিত হয়েছিল।

অনেকে জানেন, আবার অনেকে জানেন না। বরং এই কথাটি খুব বেশি উচ্চারিত হয়–'মহান মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকা বাংলাদেশের পক্ষে ছিল না।' যখন এভাবে বলা হয়, তখন গোটা আমেরিকাকেই বোঝায়। দেশটির সাধারণ মানুষও পড়ে যায় এর মধ্যে। অথচ এখানে অন্য গল্পও রয়েছে। রয়েছে পাশে দাঁড়ানোর অন্য ইতিহাসও। কোনো রাজার নীতিই যে আসল নীতি না, সাধারণ মানুষের নীতিই যে সব সময় জোরালো হয়ে ওঠে, তার উদাহরণ কিন্তু পৃথিবীতে অনেক। তেমনি একটি উদাহরণ 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'।

রাজা আসে, রাজা যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ একই থেকে যায়। তাই বলা হয়, সাধারণ মানুষের শক্তিই আসল শক্তি। যে কারণে কনসার্ট ফর বাংলাদেশের মতো একেকটি অমর সৃষ্টি তৈরি হয়। বলতে পারেন, কনসার্ট ফর বাংলাদেশের উদ্যোক্তা, তাঁরা তো সাধারণ মানুষ নন। কিন্তু আমি বলব, তাঁরা সাধারণে অসাধারণ, আমজনতারই লোক। ফলে বুঝতেই পারছেন, কোনো দেশের শাসনতন্ত্র যদিও কোনো একটি নীতি নিয়ে থাকে, সাধারণ মানুষ সেই নীতি উল্টে দিতে পারে। পৃথিবীর দেশে দেশে এমন অসংখ্য উদাহরণ

রয়েছে। সেদিন আমেরিকার অসংখ্য বিবেকবান মানুষ ঠিকই বাড়িয়েছিলেন ভালোবাসার হাত। বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না।

মুক্তিকামী মানুষ যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুদ্ধে; পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তখন গোটা দেশকে করে তোলে বিভীষিকাময় এক মৃত্যুপুরী। দেশজুড়ে হত্যা, নির্যাতন আর রক্তের নদী। বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয় অনেকে। মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেওয়া বাংলার সর্বস্তরের জনতা বিপুল বিক্রমে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বিভিন্ন দেশ এসে পাশে দাঁড়ায়। আসে বিরোধিতাও। তবে দিনে দিনে গড়ে ওঠে বিশ্বজনমত। বাঙালির ন্যায়সংগত দাবির প্রতি সমর্থন জানায় অগণিত বিবেকবান মানুষ। নানাভাবে তারা বাড়িয়ে দেয় সহায়তার হাত। পাশে দাঁড়ানোর, তেমনি একটি অসাধারণ ও অসামান্য উদ্যোগের নাম 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'।

দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের পহেলা আগস্ট, রবিবার। প্রথমে বলা হয়েছিল; কনসার্ট হবে একটি। কিন্তু মানুষের চাপে শেষ পর্যন্ত দুপুর আড়াইটায় এবং রাত ৮টায় দুটি শো করতে বাধ্য হয়েছিলেন আয়োজকরা। একদিকে মানবতা; অন্যদিকে বিশ্বের তখনকার সংগীত মহাতারকারা জড়ো হয়েছিলেন এক ছাদের নিচে। পৃথিবীর মানুষ তাকিয়ে দেখেছিল, অনন্য মহিমায় কিভাবে একটি আবেগমাখা ইতিহাস রচিত হয়েছিল।

কিন্তু কী ছিল সেই আয়োজনের প্রেক্ষাপট! তখন বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতা আর মানবতার বিপর্যয় দেখে অনেকের মতো কেঁদে উঠেছিল এক মানবতাবাদী মানুষের হৃদয়। তিনি পণ্ডিত রবিশঙ্কর। ভারতীয় এই বাঙালি সেতারবাদকের তখন জগৎজোড়া খ্যাতি। তিনি তখন বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বন্ধু জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে কথা বলেন। শরণার্থী মানুষগুলোকে সহায়তা করতে একটি কনসার্ট আয়োজনের কথা বলা হয়। সেই প্রস্তাবে সাড়া দিতে খুব বেশি সময় নেননি জর্জ হ্যারিসন। মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে এই আয়োজনটি করে ফেলেন।

জর্জ হ্যারিসন তখন তাঁর অন্য বন্ধুদের, নিউ ইয়র্কের জগদ্বিখ্যাত ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের সেই কনসার্টে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। তাঁর সাবেক দল দ্য বিটলসের সদস্যদেরও তিনি সেই কনসার্টে অংশ নেওয়ার অনুরোধ করেন। পল ম্যাকার্টনি যোগ দিতে চাননি। জন লেনন বলেছিলেন যোগ দেবেন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে মামলাসংক্রান্ত জটিলতায় শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি তাঁরও। মিক জ্যাগার ছিলেন ফ্রান্সে। শেষ পর্যন্ত বিটলস ব্যান্ডের শুধু রিঙ্গো স্টার যোগ দেন ঐতিহাসিক সেই কনসার্টে।

তবে এখানেই থেমে থাকেননি জর্জ হ্যারিসন। অন্যদেরও আহ্বান জানান। তাতে সাড়া দিয়ে এসেছিলেন বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, বিলি প্রিস্টন, লিয়ন রাসেল আর হ্যারিসনের নতুন দল ব্যাড ফিঙ্গারের যন্ত্রীদলসহ অনেকে। বিটলস ভেঙে যাওয়ার পর এটিই ছিল হ্যারিসনের সরাসরি অংশগ্রহণ করা প্রথম কোনো অনুষ্ঠান। এরিক ক্ল্যাপটনও এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রায় পাঁচ মাস পর কোনো সরাসরি অনুষ্ঠানে গান গাইলেন। আর ১৯৬৯ সালের পর বব ডিলানও প্রথমবারের মতো শ্রোতা-দর্শকদের সামনে এলেন।

রবিশঙ্করের সঙ্গে উপমহাদেশের কিংবদন্তি সরোদবাদক আলি

আকবর খানও ছিলেন অগ্রভাগে। তবলায় ছিলেন আল্লা রাখা আর তানপুরায় কমলা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই তাঁদের মিলিত প্রয়াস, বাংলা ধুন, সবাইকে মুগ্ধ করে।

জর্জ হ্যারিসন আর পণ্ডিত রবিশঙ্করের উদ্যোগে আয়োজিত সেই উদ্যোগ ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নামে। সেদিনের জগদ্বিখ্যাত তারকাদের অংশগ্রহণে কনসার্টটির প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বিশেষ করে সেই কনসার্টের প্রতিক্রিয়া হয়েছে অনেক। যাতে করে অনেক বেশিসংখ্যক মানুষ জেনেছিল বাংলাদেশের নাম। ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে প্রায় ৪০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে গোটা বিশ্ব সেদিন আরো ভালো করে জেনেছিল পাকিস্তানি হায়েনারা কী তাণ্ডবই না চালাচ্ছে বাংলার সবুজ জমিনে। মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে, মনে দাগ কেটেছে সেই আয়োজন।

দুটি বেনিফিট কনসার্ট ও অন্যান্য অনুষঙ্গ থেকে পাওয়া অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় আড়াই লাখ ডলার। এই অর্থ পরে ইউনিসেফের মাধ্যমে শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকাশিত হয় কনসার্টের লাইভ অ্যালবাম; যা রীতিমতো বিক্রির রেকর্ড গড়ে। একটি বক্স থ্রি রেকর্ড সেট এবং অ্যাপল ফিল্মসের তথ্যচিত্র ১৯৭২ সালে চলচ্চিত্র আকারে প্রকাশিত হয়।

এই চলচ্চিত্রটি শুরু হয় রবিশঙ্কর আর জর্জ হ্যারিসনের, কনসার্টটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার, সংবাদ সম্মেলনের দৃশ্য দেখানোর মধ্য দিয়ে। এরপর একে একে কনসার্টের প্রেক্ষাপট, আয়োজন আর মানুষের অংশগ্রহণ উঠে আসে এই চলচ্চিত্রে। জর্জ হ্যারিসন মঞ্চে উঠে তাঁর জনপ্রিয় অ্যালবাম All Things Must Pass থেকে প্রথমে গান শোনান। এরপর একটু একটু করে কানসার্টটি এগিয়ে চলে। গান করেন বিলি প্রিস্টন, রিঙ্গো স্টার, লিয়ন রাসেল ও বব ডিলানের মতো জগৎসেরা শিল্পীরা। জর্জ হ্যারিসন এই মঞ্চেই গেয়ে শোনান তাঁর লেখা ও সুর করা সেই ঐতিহাসিক গানটি। আর এভাবেই একটি স্বাধীন দেশের জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে যায় পৃথিবীর অগণিত মানুষের প্রিয় শিল্পীদের নাম। জর্জ হ্যারিসন, পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং অন্যদের প্রতি তাই অতল শ্রদ্ধা।

▮ শামীম আল আমিন

লেখক : কালের কণ্ঠ'র উত্তর আমেরিকার বিশেষ প্রতিনিধি

দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১ আগস্ট ২০১৯

স্বপ্ন ছোঁয়ার হেমন্ত

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। এখানে বৈচিত্র্যময় ছয়টি ঋতু আসে নানান রূপ আর উপহারের ডালি নিয়ে। তাই সারাটা বছর জুড়ে আবহাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন পালা বদলের খেলা চলে, তেমনি প্রকৃতিও দুহাত উজাড় করে বিলায় নানা রকম ফল-ফসলের সম্ভার। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত–এ ছয়টি ঋতুই তাই আমাদের সামনে আসে ভিন্ন ভিন্ন চেহারায়, ভিন্ন ভিন্ন আমেজ নিয়ে। প্রকৃতির রূপ বদলের এই পরিক্রমায় যেন বাঁধা পড়েছে বাংলাদেশের মানুষের জীবন, আমাদের স্বপ্ন-প্রত্যাশা আর আশা-আকাঙ্ক্ষা। তাই ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন, কাজকর্ম আর চিন্তাভাবনায়ও আসে পরিবর্তন। পালটে যায় কাজকর্মের ধরণও। আমাদের ছয় ঋতুর চতুর্থ ঋতু হেমন্ত সম্পর্কেও এই একই কথা খাটে।

হালকা হালকা শীতের আমেজ মেশানো আর সোনা ঝরা শিশিরের হাসি ছড়ানো তৃতীয় ঋতু হেমন্ত আসে স্নিগ্ধ মিষ্টি মেয়ে শরতের পরপরই। বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ এই দুই মাস হেমন্ত ঋতু। ইংরেজি মাসের হিসেবে পড়বে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। এই ঋতুতে আবহাওয়া থাকে আরামদায়ক-দিনে রোদের বেশ তেজ থাকলেও ততটা অসহনীয় নয়; বিশেষ করে অগ্রহায়ণ মাসে গরম অনেক কমে যায়। কার্তিক মাস থেকেই রাতে হালকা হালকা শিশির পড়তে শুরু করে, অগ্রহায়ণ মাসে যার পরিমাণ বেড়ে যায়। ঘাস, গাছের পাতা আর ধানের শীষে জমে থাকা শিশির কণার ওপর সকালের মিষ্টি রোদ পড়ে মুক্তোর মতো ঝিকমিক করে। সে এক চমৎকার দৃশ্য, যা হেমন্ত ঋতুর শৈল্পিক অলংকার।

হেমন্ত ঋতুর আসল রূপ-শোভা দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে গ্রাম বাংলায়। শহরের যান্ত্রিক জীবন আর রুক্ষ পরিবেশে সেই শোভা, সেই মাধুরী কোথায় পাওয়া যাবে! সকালের সোনা রোদ আর শিশিরের মনোমুগ্ধকর জাদুর খেলা ছাড়াও অগ্রহায়ণে গাঁয়ের মাঠে মাঠে লেগে যায় নতুন আমন ধান কাটা এবং সেই ধান মাড়াই ও ঘরে তোলার, কবি নজরুলের ভাষায়, 'অঘ্রাণে মাগো আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরে অবনী'। পল্লীবাংলার মানুষের ধান ঘরে তোলার এই যে ধুম, এ যেন নিছক ফসল তোলার ব্যস্ততা শুধু নয় আগামী দিনের প্রত্যাশা আর স্বপ্নকে নিজের ভাণ্ডারে জমা করে নেয়ারও এক আনন্দপূর্ণ আয়োজন।

ধান কাটার পাশাপাশি বাঙালির ঘরে ঘরে শুরু হয়ে যায় নবান্ন উৎসব। 'আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরা' চালের গুঁড়ি দিয়ে বানানো হরেক রকমের পিঠে পুলি, চিড়ে, মুড়ি, খই ভাজার উৎসব, নতুন জামাই আর মেয়েকে দাওয়াত দেয়া, নানান উপহার দিয়ে তাদের খুশি করা এসবই হেমন্ত ঋতুকে ঘিরে বাংলার মানুষের ভিন্নতর আনন্দ আয়োজন, আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির এক নান্দনিক প্রকাশ, যা চলে শীতকাল পর্যন্ত।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যেও নতুন ফসল তোলাকে ঘিরে নবান্ন উৎসবের প্রচলন আছে, তবে সময় ও উৎসবের ধরনে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সাঁওতালরা বাঙালিদের মতো ফসল তোলার শুরুতে নয়, নবান্ন উৎসব পালন করে পৌষ-মাঘ মাসে, শীতের ফসল তোলা শেষ হলে। এ উপলক্ষে তারা সাত দিন সাত রাত নাচ-গান আর বিশেষ খাওয়া দাওয়ারও আয়োজন করে। গারো উপজাতিরাও এভাবে নাচ-গান আর পান-ভোজনের মাধ্যমে নবান্নের উৎসব পালন করে। ম্রু জাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা নবান্ন উৎসব উপলক্ষে দেবতার উদ্দেশে মুরগি বলি দেয় এবং নতুন চালের ভাত আর সেই মুরগির মাংস দিয়ে আত্মীয়স্বজনকে আপ্যায়ন করে।

হেমন্ত ঋতুর আরেক শোভা মাঠে মাঠে রবি শস্যের সমাহার। বিশেষ করে মন মাতানো হলুদ ফুলের সরিষা, বিভিন্ন জাতের কলাই, তিল-তিশি, ছোলার তরতাজা বাড়ন্ত ঝাড় আর সবুজে-সবুজে ভরা গমের খেত প্রকৃতির রূপ শোভা যেমন বাড়িয়ে দেয়, তেমনি মানুষের স্বপ্ন পূরণেরও প্রতীক সেগুলো। উল্লেখ্য, ধান পাটের মতো আমাদের অর্থনীতিতে এসব রবি ফসলেরও রয়েছে বিশেষ অবদান। হেমন্তের প্রাকৃতিক শোভাকে আরও বাড়িয়ে দেয় নানান জাতের ফুল জুঁই, শাপলা, গোলাপ, কুমুদ বা পদ্ম, ম্যাগনোলিয়া, করবী, বোগেনভেলিয়া প্রভৃতি। এ সময় নদী-খাল-বিলে পাওয়া যায় হরেক রকমের মাছ। শীতের নানা ধরনের সবজিও উঠতে শুরু করেছে বাজারে। সব মিলিয়ে হেমন্ত আমাদের সামনে হাজির হয় ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য আর মেজাজ নিয়ে। চমৎকার এক ভাল লাগার অনুভূতি নিয়ে। হেমন্ত আসে বাংলার বুকে শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে। সেই সাথে নানা রকমের উপহারের ডালি নিয়ে।

মুস্তাফা মাসুদ

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ নভেম্বর ২০১৪

পাখির জন্য আলিদেওনা গ্রামবাসীদের অন্যরকম ভালোবাসা

নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে খাজুর ইউনিয়নে অবস্থিত আলিদেওনা গ্রাম। এখানে সরু রাস্তার দুই ধারের গাছে গাছে টানানো আছে বিভিন্ন পাখির আদলের সাইনবোর্ড। এগুলোতে পাখি শিকার রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বার্তা রয়েছে। যেমন 'পাখি শিকার করবেন না', 'পাখি মারবেন না', 'পাখিরাও আমাদের মতো বাঁচতে চায়', 'পাখি এ সমাজের পরম বন্ধু, তাদের আগলে রাখতে সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে' ইত্যাদি।

আলিদেওনা গ্রামে বিভিন্ন প্রজাতির হাজার হাজার পাখির বাস। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরেক রকম বক, শামুকখোল, রাতচোরা, সারস, মাছরাঙা, পানকৌড়ি ও বিভিন্ন প্রজাতির ঘুঘুসহ নাম না জানা অনেক পাখি। গ্রামের আনাচে-কানাচে বাঁশে ও গাছে সারাক্ষণ পাখির কলতান শোনা যায়। পাখির কিচিরমিচির শব্দে ঘুম ভাঙে গ্রামবাসীর। এজন্য আলিদেওনা গ্রামের নাম হয়ে গেছে পাখি গ্রাম! এখানে এলে মুগ্ধ হন প্রকৃতিপ্রেমীরা। বাচ্চা ওঠানোর মৌসুমে শামুকখোল ও বকের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে প্রতিদিনই বিপুলসংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটে।

স্থানীয়রা আলিদেওনা গ্রামকে পাখি শিকার মুক্ত এলাকায় রূপান্তর করেছেন। তাদের উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছে নিরাপদ আবাসস্থল। পাখি শিকার রোধে নানান উদ্যোগ নিয়েছেন গ্রামবাসী। ফলে সারাবছরই হাজার হাজার পাখির সমাগম থাকে। তাদের যত্নে দায়িত্ব পালন করেন সবাই।

পাখি সংরক্ষণে গ্রামের মানুষদের এককাতারে এনেছেন নির্মল বর্মণ। তিনি আলিদেওনা পাখি সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি। তার কথায়, 'আলিদেওনা গ্রামবাসীর ভালোবাসার সুবাদে এখানে পাখিদের আবাসভূমি গড়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা অন্য কোনও কারণে পড়ে যাওয়া বাচ্চাগুলোকে গ্রামবাসী যত্নের সঙ্গে মা পাখিদের বাসায় পৌঁছে দেন তারা।'

জেলার সর্ববৃহৎ পাখিকলোনি আলিদেওনাকে সরকারিভাবে পাখির অভয়ারণ্য ঘোষণার পাশাপাশি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি জানান আলিদেওনা পাখি সংরক্ষণ কমিটির সভাপতির মতো স্থানীয় পাখিপ্রেমী, সমাজসেবী ও পরিবেশবিদরা।

এ প্রসঙ্গে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মিজানুর রহমান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'জেলার আলিদেওনা এখন পাখি গ্রাম হিসেবে মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। তাই পাখির অভয়ারণ্যসহ গ্রামটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।'

আব্দুর রউফ পাভেল
বাংলা ট্রিবিউন, নভেম্বর ১১ ২০১৯

অংকুর

রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা

নৈতিকতা উন্নয়নে যুবসমাজের ভূমিকা

লিজা আক্তার
সদস্য: ১০৮৮/২০১৪

তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত

[মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২০১৮-'১৯ এ আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত ৩টি রচনা নবীন পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবারের সংখ্যায় তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাটি প্রকাশ করা হলো]

ভূমিকা : যে-কোনো দেশ ও জাতির প্রাণশক্তি হলো যুবসমাজ। আজকের তরুণ আগামী দিনের কর্ণধার। যারা বয়সে নবীন, মন যাদের বিশ্বাসে ভরপুর, যাদের চোখে স্বপ্নের আল্পনা, বুকে অদম্য সাহস, হৃদয়ে নব সৃষ্টির উম্মাদনা, যারা অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না, যারা জীর্ণ পুরাতনকে ভেঙ্গে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চায়, যৌবনের দুরন্ত বাতাস যাদেরকে চালিত করে তারাই যুবক, তারাই তরুণ। ভোরের উদিত সূর্যের মত পরিপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় যুবসমাজ যে-কোনো সময় জাতির ভাগ্যাকাশের কালো মেঘ বিদূরিত করতে আগ্রহী ভূমিকা পালন করছে। নৈতিকতা উন্নয়নে যুবসমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

নৈতিকতা কি: নৈতিকতা ল্যাটিন শব্দ 'মোরালিটাস' থেকে আগত, যার অর্থ চরিত্র, ভদ্রতা, সঠিক আচরণ। নৈতিকতা হলো ভালো এবং খারাপ বিষয়সমূহের মাঝে উদ্দেশ্য সিদ্ধান্ত ও প্রতিক্রিয়াসমূহের পার্থক্য ও পৃথকীকরণ। নৈতিকতা শিখতে হবে একেবারে ছোট বয়স থেকে। এটা শুধু শ্রেণিতে চর্চা করে পুরোপুরি ফলদায়ক হওয়া সম্ভব না। বিশ্বের কল্যাণকর বিষয়গুলোর অন্যতম নির্ণায়ক হলো নৈতিকতা। মানবজীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে গড়ে তোলার জন্য সব মানুষকেই নৈতিক গুণে গুণান্বিত হওয়া প্রয়োজন। জার্মান শিক্ষাবিদ জোহান ফ্রিডারিক হার্বার্টের মতে, 'চরিত্র গঠন হচ্ছে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।'

যুবসমাজ ও নৈতিকতা : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হলে, নৈতিকতাসম্পন্ন যুবসমাজ হলো জাতির হৃৎপিণ্ড। তাই আদর্শ জাতি গঠন করতে হলে আগে

নৈতিকতা হলো ভালো এবং খারাপ বিষয়সমূহের মাঝে উদ্দেশ্য সিদ্ধান্ত ও প্রতিক্রিয়াসমূহের পার্থক্য ও পৃথকীকরণ। নৈতিকতা শিখতে হবে একেবারে ছোট বয়স থেকে। এটা শুধু শ্রেণিতে চর্চা করে পুরোপুরি ফলদায়ক হওয়া সম্ভব না। বিশ্বের কল্যাণকর বিষয়গুলোর অন্যতম নির্ণায়ক হলো নৈতিকতা। মানবজীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে গড়ে তোলার জন্য সব মানুষকেই নৈতিক গুণে গুণান্বিত হওয়া প্রয়োজন।

জাতির যুবসমাজকে নৈতিকতা সম্পন্ন শিক্ষা দিতে হবে। পৃথিবীতে যত জাতি বা সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে তার বেশিরভাগ জাতি বা সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে নৈতিকতা বিচ্যুতির কারণে। আমরা যদি পূর্বের আদ্ জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে চাই দেখা যাবে আদ্ জাতি ধ্বংসের মূল কারণ ছিল নৈতিক অধঃপতন। তাদের জাতির লোকেরা সমাজের সকল ধরনের নিকৃষ্ট কাজের সাথে জড়িত ছিল। পরবর্তীতে আমরা যদি রোমান সভ্যতার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো তাদের পতনের মূল কারণগুলোর মধ্যে ছিল ভোগবিলাস ও অনৈতিক চরিত্র। আমরা যদি সাম্প্রতিক কালের মোগল সভ্যতার পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে তাদের ধ্বংস হওয়ার মূল কারণ ছিল চরম ভোগবিলাস ও নৈতিকতার চরম অবক্ষয়। পৃথিবীতে আরো অসংখ্য জাতির ধ্বংসের কারণ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে নৈতিক অধঃপতনের কারণেই তারা ধ্বংসের অতলগর্ভে তলিয়ে গেছে। তাই আমাদের জাতিসত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে বা আমাদের এই আধুনিক সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যুবসমাজের নৈতিকতার দিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আজ আমাদের সমাজে শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণীজন, মুক্তমনা বুদ্ধিজীবী সমাজে যারা আছেন তাদের মনটাকে আরও প্রসারিত করে, চিন্তার জগৎকে আরও প্রসারিত করে, জ্ঞানের জগৎকে আরও সম্প্রসারিত করে দেখলে বুঝতে পারবে যে জাতির যুবসমাজকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়াটা কতটা জরুরি।

যুবসমাজকে নৈতিক শিক্ষা প্রদান: শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড, আর শিক্ষারুপ মেরুদণ্ড নিজের মহিমা প্রকাশের মাধ্যমে যুবসমাজকে আলোকিত পথে পরিচালনা করে। আলোকিত যুবসমাজ জাতিকে উন্নতকরণের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট জাতির রুপদান করে। অর্থাৎ যুবসমাজ জাতির ভবিষ্যৎ। সুতরাং কোনো জাতির যুবসমাজ যদি নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে বিপথে ধাবিত হয়, তবে সে দেশের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত অন্ধকারাচ্ছন্ন। একটি জাতিকে উন্নত করতে হলে সে দেশের যুবসমাজকে উন্নত করতে হবে আর এর সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো নৈতিক শিক্ষা।

জন মিল্টন বলেছেন, 'Education is the harmonies development of mind, body and soul.'

হারম্যান হর্ন লিখেছেন, 'শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে মুক্ত সচেতন মানবসত্তাকে সৃষ্টিকর্তার সাথে উন্নত যোগসূত্র রচনা করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া, যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগগত ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয় পরিবেশে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবধর্ম নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'মানুষের মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তার পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই হচ্ছে শিক্ষা।'

তাই যুবসমাজকে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে সেই শিক্ষার সাথে ধর্মীয় বা নৈতিক শিক্ষা আছে কিনা একটু পর্যালোচনা করে দেখাটা বড় জরুরি। এছাড়াও শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

জন ডিউই বলেছেন, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মোপলব্ধি।'

প্লেটোর মত হলো, 'শরীর ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সবই শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।'

বার্ট্রান্ড রাসেল এর মন্তব্য হলো, 'The education system we must aim at producing in the future is one which gives every boy and girl opportunigy for the best that exists.' যুবসমাজের মাঝে এই নৈতিক শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পাশাপাশি পরিবারকেও সর্বোপরি সমাজের সকল প্রকার সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসার প্রয়োজন।

সমাজ গঠনে যুবসমাজের কার্যকর অংশগ্রহণ : আমাদের দেশের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যুবসমাজ। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মানবিক গুণাবলি তৈরি ইতাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। তাহলে এই তরুণ সমাজ আমাদের দেশ গঠনে, দেশের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে সমাজ গঠনে যুবসমাজ ভূমিকা রাখতে পারে না। শান্তি একটি আপেক্ষিক বিষয়। দেশের ঐতিহাসিক সব অর্জনের মধ্যে যুবসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যদি ২০২১ সালে মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে চাই, তাহলে অবশ্যই যুবসমাজের উন্নয়ন করতে হবে। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে থেকে অনেক বেশি রোল মডেল তৈরি করতে হবে। সাংবিধানিক অধিকারগুলো তরুণদের জানানো প্রয়োজন। যুবসমাজকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিলে তারা সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারবে। যুবসমাজ যদি সঠিক তথ্য না পায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানে অংশগ্রহণ করতে না পারে, তাহলে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভূমিকা রাখা অসম্ভব। মাঠপর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন কমিটিতে যুবদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ কর্মপরিকল্পনায়, বাস্তবায়নে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ প্রায়ই থাকে না। কার্যকর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোও বিবেচনায় রাখা জরুরি। যুবসমাজ বিদেশে যাওয়ার আগে যেন দক্ষ প্রশিক্ষণ পান, সে বিষয়টা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাহলে বিদেশে গিয়ে মানসম্মত কাজ করতে পারবেন। তা না হলে বিদেশে গিয়ে তারা মানসম্মত কাজ করতে পারবেন না। উপরন্তু নিজেরা বিভিন্ন সমস্যায় পরবেন। কারণ, মানুষগুলোর পেছনে ইতিমধ্যে অনেক পরিবার তাদের সর্বস্ব বিনিয়োগ করে ফেলে। যুবসমাজের জন্য শুধু বড় ডিগ্রির ব্যবস্থা করলে হবে না, এদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে যুবসমাজ ভবিষ্যতে সমাজ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্র : সমাজ, দেশে ও জাতির নৈতিকতা উন্নয়নে যুবসমাজ বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের কাজের ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন: নৈতিক অবক্ষয় রোধ, সন্ত্রাস নির্মূলকরণ, দেশপ্রেম জাগানো, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি।

নৈতিক অবক্ষয়রোধ : তারুণ্যই একটি দেশ ও জাতির প্রধান চালিকাশক্তি, সমাজ বদলের অন্যতম হাতিয়ার। তাদের মাঝে বিরাজ করে আগামীর সুন্দর সম্ভাবনা। যুগে যুগে তরুণ সমাজই অসত্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছে। ১৯৫২ সালে তরুণ সমাজ মাতৃভাষার জন্য অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছিল বলে আমরা পেয়েছি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'।

১৯৭১ সালে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে বুকের সতেজ রক্ত ঢেলে দিয়েছিল বলে আমরা স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে আনতে পেরেছি, দেশকে করেছি শত্রুমুক্ত। ১৯৯০ সালের উত্তাল দিনগুলোতে যুবসমাজই স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল বলে আমরা পেয়েছি পূর্ণ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা। বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সুনামী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই যুবসমাজই সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছে। অনাকাঙ্ক্ষিত সময়ের প্রেক্ষিতে যুবসমাজই বাড়িয়ে দিয়েছে কাঙ্ক্ষিত হাত। তারুণ্যের দীপ্তময়ী অংহকারে যুবসমাজ গৌরবান্বিত। ভোরের উদিত সূর্যের মতো পরিপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় যুবসমাজ যে-কোনো সময় জাতির ভাগ্যাকাশের কালো মেঘ বিদূরিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সুস্থ, সুন্দর ও প্রগতিশীল সমাজের বুকে যখনই কোনো চক্রান্তের জাল বিস্তার করতে চেয়েছে, তখনই যুবসমাজ তা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। সমাজের অশুভ শক্তিকে করেছে দূর। অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত সময়ের বিবর্ণ পরিবেশকে করেছে প্রত্যাশার শুভলগ্ন। জাতির দুর্দিনে দেশের প্রয়োজনে যুবসমাজই বারবার এগিয়ে এসেছে। যুবসমাজ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের বহু অন্যায় উচ্ছেদ করে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। যুবসমাজ যদি ঘুষ-দুর্নীতিসহ সকল প্রকার নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তাহলে বাংলাদেশ হতে পারে একটি দুর্নীতিমুক্ত নৈতিকতা সম্পন্ন দেশ।

সন্ত্রাস নির্মূলকরণ: সন্ত্রাস আজ দেশ গড়ার পথে এক মারাত্মক অন্তরায় হয়ে আছে। নৈতিকতা উন্নয়নের মাধ্যমেই এই সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব। আর এই নৈতিকতা উন্নয়নে যুবসমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যুবসমাজই পারে একটি দেশকে, জাতিকে নৈতিক অধঃপতনের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে নৈতিকতার উন্নয়ন করতে।

দেশপ্রেম জাগানো : একটি মানুষের চরিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ হলো তার দেশপ্রেম। জ্ঞানার্জনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় যুবসমাজের মাঝে উপ্ত হয় সেবার আদর্শ, দেশপ্রেমের ক্ষুদ্র বীজ যা তার পরবর্তী কর্মবহুল-জীবনে ধারণ করে বিশাল মহীরুহের আকারে। বাস্তবজ্ঞানের আলোকে দেশের কর্তব্যের আহ্বানে যুবসমাজই পারে দেশপ্রেমের আদর্শে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে এবং স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বছরগুলোর ভাষা আন্দোলনে, স্বাধীকার আন্দোলনে এ দেশের যুবসমাজ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে মহান আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল তা আজ ও ইতিহাস হয়ে আছে। যুবসমাজই পারে দেশের সর্বস্তরের মানুষদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে মহান ঐক্য ও সংহতির পক্ষপাতহীন মন্ত্রবাণী। যার মধ্যে দেশপ্রেম থাকবে সে কখনই দেশের মধ্যে খারাপ কাজে লিপ্ত হতে পারবে না। খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। যেসব কাজ করলে দেশ ও জাতির ক্ষতি হবে অর্থাৎ নৈতিক অধঃপতন হবে সেসব কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। অর্থাৎ যুবসমাজই পারে জাতির মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলে নৈতিকতার উন্নয়ন করতে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ : নৈতিকতা উন্নয়নের জন্যই নয় বরং জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্যও নৈতিকতা সম্পন্ন শিক্ষা প্রয়োজন। নিরক্ষরতা দূর করে শিক্ষার হার বাড়াতে পারলে সে দেশের নৈতিকতার উন্নয়ন হবে। নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি তার নীতিতে অটল থাকে। শিক্ষা মানুষকে যেমন একজন সঠিক ও শুদ্ধ মানুষ রুপে গড়ে তোলে তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও মানুষকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। শুধু শিক্ষার হার বাড়িয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ করলেই নৈতিকতার উন্নয়ন সম্ভব নয়, নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে শিক্ষার হার বাড়িয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ করতে পারলেই নৈতিকতার উন্নয়ন হবে। নৈতিক শিক্ষা থাকার কারণেই মানুষ তার নিজের পরিবারের সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতি সকল দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে। নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ অন্যকে ও উৎসাহিত করে নীতিবান হতে, মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখাতে। যার মধ্যে নৈতিক শিক্ষা থাকে পারিপার্শ্বিকতার দোহাই দিয়ে সে অন্যায়-অপরাধ করে না। বরং সে নৈতিকতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করে। যুবসমাজ একটি জাতিকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নৈতিকতার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক অবক্ষয় রোধে যুবসমাজের করণীয় : যেখানে নৈতিকতা অনুপস্থিত যেখানে সামাজিক অবক্ষয় সবচেয়ে বেশি। দেশের সর্বাঙ্গে আজ নৈতিকতার অনুপস্থিতির কারণে এ অবক্ষয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে নিপীড়নের স্বীকার, পদ পদবির লোভ ইত্যাদি কারণে মানুষ নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ হচ্ছে, দেশের সর্বত্র মাদকের জয় জয়কার ধ্বনি। দেশে যে প্রান্তে থাকুক না কেনো নৈতিক অবক্ষয় হয়েছে এমন মানুষকে মাদক গ্রাস করেছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরাই সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করছে। বিবাহবন্ধনে কঠিনতম পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, বিবাহ পূর্ব সম্পর্ক, বিবাহ করে পরকীয়া সম্পর্ক, বিবাহ সম্পন্ন না হওয়া, একক সিদ্ধান্তে বিবাহ দেওয়া ইত্যাদি সমাজের রন্ধ্রেরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে যার কারণে সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়াও সম্পদের লোভে ন্যায় বিচারের অনুপস্থিতি, নৈতিক শিক্ষার অভাব, নারীদের বৈচিত্র্যময়, উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ পোশাক ও সমাজে হালাল হারামের অনুপস্থিতি সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুবসমাজ এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গড়ে তুলতে পারে। সামাজিক সমস্যা দূর করতে রাষ্ট্রের সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এই দায়িত্ব পরিবার তথা সমাজকেই নিতে হবে। যুবসমাজের প্রচারনামূলক, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম একটি দেশের জাতির নৈতিকতা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। নৈতিকতার উন্নয়ন হলেই এই ধরনের সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

উপসংহার : আজকের তরুণরাই আগামী দিনের দেশ ও জাতির কর্ণধার। যুবসমাজই পারে সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দেশের সার্বিক কল্যাণ করতে। যুবসমাজই সমাজ বদলানোর একমাত্র হাতিয়ার। যুবসমাজ শুধু নৈতিকতা উন্নয়নে নয়, দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বলেছেন–

'পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এদেশের মাঝে আঠারো আসুক নেমে।'

সমালোচনা হলো আয়নায় নিজেকে দেখার সুযোগ

মাইক্রোসফটকে অনেক সমালোচনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। আমি বলব, সমালোচনার সময়টাই আয়নার দিকে তাকানোর সুযোগ। যখন তোমাকে নিয়ে সমালোচনা হবে, তখন তুমি আয়নায় নিজেকে দেখো এবং ভাবো, কেন তুমি সমালোচিত হচ্ছ। হতে পারে তোমার কিছু পরিবর্তন আনা দরকার। আমি মনে করি, সমালোচনাকে স্বাগত জানানো উচিত। কারণ, সমালোচনা থেকে শেখার আছে।

ভারতের হায়দরাবাদ পাবলিক স্কুলের ছাত্র ছিলেন সত্য নাদেলা। এখন তিনি বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব বিজনেসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন নিজের জীবনদর্শনসহ নানা বিষয় নিয়ে।

আমার বাবা মারা গেছেন গত মাসে। তিনি ছিলেন একজন মার্কসবাদী, অর্থনীতিবিদ, সরকারি চাকুরে। জীবন সম্পর্কে তাঁর একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। মনে আছে, আমার নম্বরপত্র দেখে তিনি অবাক হয়ে বলতেন, একজন মানুষ এত খারাপ রেজাল্ট করে কী করে! তবে তিনি আমাকে খুব অনুপ্রাণিতও করেছেন। আমার মা ছিলেন একদম উল্টো। তাঁর প্রশ্ন ছিল একটাই, 'তুমি খুশি তো?' নম্বরপত্রের দিকে তাকিয়ে আমি কিছুতেই বুঝতাম না, এখানে খুশি হওয়ার মতো কী থাকতে পারে! ভারতের হায়দরাবাদে ১৯৭০-৮০-এর দশকে আমি যে স্কুলে পড়েছি, সেটা খুব একটা পরিচিত ছিল না। মজার ব্যাপার হলো, সেই স্কুলের বেশ কয়েকজন ছাত্র এখন বড় বড় প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদে আছেন।

হায়দরাবাদ থেকে বের হব, ছোটবেলায় এটা কখনো আমার মাথায় আসেনি। ভাবতাম, আমি শুধু ক্রিকেট খেলব আর বড় হয়ে ব্যাংকে চাকরি করব। দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রিকেট ভীষণ জনপ্রিয়। যেকোনো খেলাই আমাদের অনেক কিছু শেখায়, বিশেষ করে যেসব খেলা দলবেঁধে খেলতে হয়। একটা ঘটনা আমি

প্রায়ই বলি। ছোটবেলায় আমাদের স্কুল ক্রিকেটে একজন অধিনায়ক ছিল। যে পরে পেশাদার ক্রিকেটেও খুব নাম করেছিল। একবার একটা ম্যাচে আমি খুব খারাপ বোলিং করছিলাম। এমন সময় অধিনায়ক নিজেই বল হাতে নিল, দারুণ একটা ওভার করে আমাদের ব্রেক থ্রু এনে দিল। তারপর আবার বল দিল আমার হাতে। পরের ওভারেই আমি সম্ভবত আমার জীবনের সেরা ৬টা বল করেছিলাম। তখন খুব অবাক লেগেছিল, কেন সে আবার আমাকে বল করতে দিয়েছিল! এখন বুঝি। আমার আত্মবিশ্বাস ভেঙে না দেওয়ার গুরুত্বটা সে বুঝেছিল। হাইস্কুল ক্রিকেটের একজন অধিনায়কের এই অনবদ্য নেতৃত্বগুণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। দলীয় খেলা এভাবেই আমাদের শেখায়।

আমার জীবনদর্শনের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে সমানুভূতি। আমি আর আমার স্ত্রী একই সঙ্গে বড় হয়েছি। আমরা এক স্কুলে পড়তাম। আমাদের প্রথম সন্তান জন্মানোর আগে দুজনই ভীষণ রোমাঞ্চিত ছিলাম। আমার স্ত্রী একজন স্থপতি। আমরা নানা রকম পরিকল্পনা করছিলাম। যেহেতু দুজনই কাজ করি, সন্তানকে কীভাবে মানুষ করব, ওকে কোন ডে কেয়ার সেন্টারে রাখব...ইত্যাদি নিয়ে আমরা ভাবছিলাম। কিন্তু ছেলেটা জন্ম নেওয়ার পর কিছু জটিলতা তৈরি হলো। জন্ম থেকেই সে একটা কঠিন অসুখে আক্রান্ত। ওর বয়স পাঁচ হওয়া পর্যন্ত আমি আর আমার স্ত্রী দুজনই ওকে বাঁচিয়ে রাখতে রীতিমতো যুদ্ধ করেছি। প্রাথমিকভাবে নিজেদের জীবন নিয়ে যা কিছু পরিকল্পনা করেছিলাম, হঠাৎই সব বদলে গেল। আমার স্ত্রী অনু আমাদের সন্তানকে নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। যত রকম চিকিৎসা সম্ভব, যত থেরাপি দেওয়া সম্ভব, সব চেষ্টাই সে করেছে। আমি শুধু দেখছিলাম আর মনে হচ্ছিল আমার জীবনটাই কেন এমন দুর্বিষহ হলো।

সে সময়ই হঠাৎ একটা বোধোদয় হলো। আমার তো আসলে কিছু হয়নি, হয়েছে আমার সন্তানের। আমার উচিত ছিল আমার সন্তানের চোখে পৃথিবীটাকে দেখা এবং বাবা হিসেবে নিজের দায়িত্বটা পালন করা। এটাই তো সমানুভূতি। জন্মগতভাবেই আমাদের সবার মধ্যে সমানুভূতির বৈশিষ্ট্য থাকে। জীবন ছোট-বড় নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের সমানুভূতি শেখায়।

আমি যখন মাইক্রোসফটে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছি, বেশ কয়েকটা ধাপ পেরোতে হয়েছে। শেষ ধাপে আমার ইন্টারভিউ যিনি নিয়েছিলেন, তাঁর একটা প্রশ্ন আমার জীবন বদলে দিয়েছে। সেই প্রশ্নটিও সমানুভূতি-সংক্রান্ত। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'ধরো তুমি একটা রাস্তা পার হচ্ছ। হঠাৎ দেখলে, একটা ছোট বাচ্চা রাস্তায় পড়ে গেছে। তুমি কী করবে?' মনে মনে ভাবলাম, 'যাহ! এই সার্চ অ্যালগরিদম তো আমি শিখিনি! এটা নিশ্চয়ই খুব জটিল কোনো প্রশ্ন!' আমি বেশ কিছুটা সময় নিয়ে ভাবলাম। তারপর বললাম, 'আমি ফোন বুথে গিয়ে ৯১১ ডায়াল করব।' বলছি স্মার্টফোন যুগের আগের কথা।

প্রশ্নকর্তা উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তোমার নিজের মধ্যে কিছুটা সমানুভূতি গড়ে তোলা উচিত। কারণ, একটা বাচ্চা যখন পড়ে যায়, তোমার প্রথম কাজ হলো তাকে কোলে নিয়ে জড়িয়ে ধরা। তারপর নাহয় ফোন করো।' মনে মনে ভেবেছিলাম, চাকরিটা বুঝি আর হলো না। যাহোক, দেখতেই পাচ্ছেন, চাকরিটা আমি পেয়েছিলাম। সত্যি বলতে, তখন সমানুভূতি নিয়ে খুব একটা ভাবতাম না। আমার মনে হয়েছিল, ব্যবসার সঙ্গে, কাজের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? এখন আমি বুঝতে পারি। আপনি যখন নতুন কিছু আবিষ্কার করবেন, আপনাকে তো কাস্টমারের চোখ দিয়ে দেখতে হবে। বুঝতে হবে, তাঁর কী প্রয়োজন। আমার কাছে এটাই সমানুভূতি। তাই আমি বিশ্বাস করি, জীবন মানুষকে সমানুভূতি শেখায় আর সফল হতে হলে সমানুভূতি খুব দরকার।

আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এটি কীভাবে গড়ে তোলা যায়, মাইক্রোসফটে আমরা ইদানীং ব্যাপারটা নিয়ে খুব ভাবছি। যেমন ধরুন, সমানুভূতির শুরু হয় শ্রদ্ধা থেকে। আপনি যখন একজন মানুষকে শ্রদ্ধা করবেন, জানবেন তিনি কোথা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশে কাজ করেই আমি শিখেছি, কীভাবে একটা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হয়। অনেকে বলে, 'স্টিভ যখন তোমাকে মাইক্রোসফট ক্লাউডের দায়িত্ব দিল, তখন কী ভেবেছিলে তুমি সিইও হতে যাচ্ছ।' সত্যি বলতে, একেবারেই না। এটা আমার ধারণাতেই ছিল না।

ব্যবসায় শিক্ষার ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আমার উপদেশ, পরের সুযোগটার অপেক্ষায় থেকো না। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়। ভাবে, আমি কবে সিইও হব। আমি বলব, তোমার সেরাটা দেওয়ার জন্য পরবর্তী চাকরির অপেক্ষা কোরো না। এখন যেখানে আছ, সেখানেই নিজের পুরোটা ঢেলে দাও। তুমি যখন যে কাজটা করছ, ধরে নাও এটাই তোমার শেষ কাজ এবং এটাই তোমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আমি মনে করি, ছোট-বড় সব প্রতিষ্ঠানেই দারুণ সব সুযোগ আছে। কাউকে নিয়োগ দেওয়ার সময় আমি সব সময় বলি, তুমি যদি নিজে 'কুল' হতে চাও, তাহলে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগ দাও। আর যদি মানুষকে 'কুল' বানাতে চাও, তাহলে মাইক্রোসফটে যোগ দাও। এ কথা বলি কারণ, আমি বিশ্বাস করি, বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করা একটা বড় দায়িত্বও। বিজনেস স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই হয়তো তুমি অনেক কিছু শিখে এসেছ, এখানে এসেও শিখবে। কিন্তু সবটাই নির্ভর করে তোমার দলটা কেমন, তার ওপর। ছোট-বড় যেমন প্রতিষ্ঠানেই তুমি কাজ করো না কেন, এক দল লোকের সঙ্গে তোমাকে কাজ করতেই হবে।

মাইক্রোসফটকে অনেক সমালোচনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। আমি বলব, সমালোচনার সময়টাই আয়নার দিকে তাকানোর সুযোগ। যখন তোমাকে নিয়ে সমালোচনা হবে, তখন তুমি আয়নায় নিজেকে দেখো এবং ভাবো, কেন তুমি সমালোচিত হচ্ছ। হতে পারে তোমার কিছু পরিবর্তন আনা দরকার। আমি মনে করি, সমালোচনাকে স্বাগত জানানো উচিত। কারণ, সমালোচনা থেকে শেখার আছে।

আমি সব সময় বলি, যখন মানুষ তোমার সাফল্য উদ্‌যাপন করতে শুরু করবে, তখনই সবচেয়ে ভীত হও।

মো. সাইফুল্লাহ
ইংরেজি থেকে অনুবাদ
দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ নভেম্বর ২০১৯

ঝাঁপা গ্রামের ভাসমান সেতু ঐক্যবদ্ধতাই যখন সমাধান

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'–কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গানের এ চরণটি বহুশ্রুত। আবার অনেকেই হয়তো অনুসরণও করি। তবে এবার তা অনুসরণ করলো একটি গ্রামের অধিবাসীরা। ঝাঁপা গ্রামবাসীর ডাক শোনেনি প্রশাসন, বিত্তবান বা ক্ষমতাধর কোনো ব্যক্তি। তাই বলে তারা বসে থাকেনি। তাদের নিজ উদ্যোগে তৈরি করেছে দীর্ঘ ও অভিনব এক ভাসমান সেতু। ইতোমধ্যে অনেকেই জেনেছেন ভাসমান সেতুটির কথা। গ্রামবাসীর উদ্যোগ ও সেতুটি নিয়ে বিস্তারিত থাকছে এ লেখায়।

ঝাঁপা

যশোরের মনিরামপুর উপজেলায় একটি বাঁওড়, ঝাঁপা। বাঁওড়ের এপাড়ে রাজগঞ্জ বাজার আর ঐ পাড়ে ঝাঁপা (বাঁওড়ের নামেই এর নাম) গ্রাম। গ্রামটিতে বসবাস করে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ। প্রতিদিনই নানা দরকারে তাদের এ বাঁওড় পেরিয়ে রাজগঞ্জ আসতে হয়। গ্রামটিকে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে এ বাঁওড়। এটি শুধু একটি মৌসুমের কথা নয়, সারা বছরই তাদের পার হতে হতো এ বাঁওড়। ফলে শত বছর ধরে যোগাযোগ সংকটে ভুগছিল গ্রামটির মানুষ। নৌকা ছিল বাঁওড় পারাপারের একমাত্র উপায়। নৌকা পাওয়া না গেলে মূল লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন থাকত গ্রামটি। যোগাযোগের এই সংকট নিয়ে বেশ কিছু মর্মান্তিক দুর্ঘটনার স্মৃতিও রয়েছে গ্রামটির। পারাপারের সময় ২০১৪ সালে স্কুল শিক্ষার্থীসহ নৌকাডুবি, পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু ও সময়মতো নৌকা না পাওয়ায় মুমূর্ষু অনেক রোগীর মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটেছে এখানে।

ভাসমান সেতু ও ঝাঁপার মানুষ

দূর থেকে দেখা যায় সবুজাভ পানির উপরে ভাসমান নীল আর কমলা রঙের সেতুটি। কাছে গেলে দেখা যায় বাঁওড়ের পানিতে নীল আর কমলার প্রতিফলন। বেশ মনোরম এ দৃশ্য, প্রথম দেখায় যে কেউ ভাবতে পারে, বিদেশি কোনো কোম্পানি স্বল্প খরচে তৈরি করে দিয়েছে এ সেতুটি। না, কোনো প্রকৌশল বা কারিগরী জ্ঞান ছাড়াই স্বল্পশিক্ষিত ঝাঁপা গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে সেতুটি। ভাসমান এ সেতু পালটে দিয়েছে এ জনপদের চিত্র। সেতুটি হওয়ার ফলে আশেপাশের নয়টি গ্রামের মানুষের যোগাযোগে এসেছে আমূল পরিবর্তন। স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থীসহ গ্রামের সকল শ্রেণি পেশার মানুষ এখন সহজেই বাঁওড় পার হতে পারছে। গ্রামবাসী আশা করছে, এ সেতু হওয়ার ফলে দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে ঝাঁপার।

হঠাৎ করেই যে সেতুটি তৈরি করা হয়েছে, ব্যাপারটা মোটেই তেমন নয়। এর জন্য প্রথমে ছোটখাটো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। একটি

২০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৮ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট ফ্রেম তৈরি করে, তা ১৬টি প্লাস্টিকের ড্রামের উপর স্থাপন করা হয়। এটি সফলভাবে ৩২ জনকে নিয়ে ভাসতে সক্ষম। এ দেখে সাহস পায় গ্রামবাসী এবং বৃহৎ প্রকল্পের দিকে অগ্রসর হয়। আগস্ট মাসের দিকে মূল সেতুটি তৈরির কাজ শুরু হয়। নির্মাণ কাজে শ্রমিকদের পাশাপাশি স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছে গ্রামবাসী। বছরের দ্বিতীয় দিন হাজার ফুট দীর্ঘ ভাসমান এ সেতুটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন স্থানীয় জেলা প্রশাসক জনাব আশরাফ উদ্দিন। এরপর থেকে আনন্দের সাথে সেতুটি ব্যবহার করছে গ্রামের মানুষ। ছোটখাট যানবাহনও পার হচ্ছে সেতুটি দিয়ে।

সেতু তো হয়ে গেল, শত বছরের যাতায়াতের জনভোগান্তিরও অবসান ঘটলো, কিন্তু নৌকা চালিয়ে সংসার চালাতো যেসব মাঝি, তাদের কী হবে? তাদেরও ব্যবস্থা হয়েছে। চারজন মাঝি, যারা আগে এ ঘাটে নৌকা চালাতো, তারাই তুলছে সেতু পারাপারের টাকা। আগে গ্রামবাসী মাঝিদের সপ্তাহে পাঁচ টাকা করে ও বছরে এক মণ করে ধান দিত নৌকা পারাপারের জন্য। আগের মতো একই খরচে এ সেতু ব্যবহার করতে পারবে তারা। কিন্তু অন্য এলাকার মানুষদের টাকা দিয়ে পার হতে হবে। এ টাকা থেকেই একটা অংশ দেওয়া হবে মাঝিদের।

সেতুর খুঁটিনাটি

লোহার বার দিয়ে তৈরি ফ্রেম বসানো হয়েছে দুই সারি প্লাস্টিকের ড্রামের উপর। ড্রামগুলো ফ্রেমের সাথে গোলাকার অ্যাঙ্গেল দিয়ে আটকানো আছে। দুই সারি ড্রামের মাঝে রয়েছে সামান্য ফাঁকা স্থান। ফ্রেমের উপর পাটাতন হিসেবে দেয়া হয়েছে লোহার সিট। সেতুর দুই পাশে রয়েছে নিরাপত্তার জন্যে লোহার রেলিং। দৈনিক প্রথম আলো'র এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, এ সেতুটি তৈরি করতে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা (মতানৈক্য থাকতে পারে) খরচ হয়েছে। পাঁচ মাস সময় লেগেছে ১ হাজার ফুট লম্বা এবং ৮ ফুট চওড়া সেতুটি তৈরি করতে। ৮৩৯টি প্লাস্টিকের ড্রামের উপর ভাসছে এটি। এতে ব্যবহার করা হয়েছে ৮০০ মণ লোহার অ্যাঙ্গেল ও বার। ২৫০টি চার ফুট প্রশস্ত লোহার সিট যুক্ত করা হয়েছে সেতুটিতে। শুষ্ক মৌসুমে বাঁওড়ের পানি কিছুটা শুকিয়ে যায়, তাই সেতুর দুই পাশে যুক্ত করা হয়েছে বাঁশের তৈরি ৩০০ ফুট সংযোগ সেতু। সেতুটি দিয়ে মানুষের পাশাপাশি ছোট যানবাহন যেমন–রিকশা, ভ্যান, নছিমন, মোটর সাইকেল, অটোরিকশা ইত্যাদি যাতায়াত করতে পারে।

পরিকল্পনা

প্রায় পাঁচ বছর আগের কথা, বাঁওড়ের পাশে বসে স্থানীয় মাদ্রাসার শিক্ষক আসাদুজ্জামান কয়েকজনের সাথে কথা বলছিলেন। তখন শ্যালো মেশিন দিয়ে বাঁওড় থেকে বালু তোলা হচ্ছিল, মেশিনটি বসানো হয়েছিল কয়েকটি প্লাস্টিকের ড্রামের উপর যাতে পানিতে ভেসে থাকে এটি। এরকম একটি ভারী মেশিনকে এ পদ্ধতিতে ভাসতে দেখে হঠাৎ তার মাথায় আসে একটি সেতুর কথা। তিনি ভাবলেন, একই পদ্ধতিতে যদি ড্রামের সাহায্যে সেতু তৈরি করা হয় এটিও নিশ্চয়ই ভাসবে।

এরপর তিনি গ্রামের মানুষের সাথে আলোচনা করেন বিষয়টি নিয়ে। সকলেরই সম্মতি ছিল তার এ পরিকল্পনায়। গ্রামবাসীর সাথে কয়েক দফা আলোচনার পর গঠন করা হয় 'ঝাঁপা গ্রাম উন্নয়ন ফাউন্ডেশন'। যদিও সেতুটি তৈরি করতে লেগেছে কয়েক মাস, এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বহু আগে। গ্রামবাসীর সাথে বৈঠকের মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০১৭ সালের ১৯ জানুয়ারি। সরকারি বা রাজনৈতিক কোনো প্রকার আর্থিক সহায়তা ছাড়াই গ্রামবাসীর অর্থায়নে তৈরি হয় সেতুটি। গ্রামের ৬০ জন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত যুবককে নিয়ে গড়ে তোলা ঐ ফাউন্ডেশনে প্রত্যেকেই ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে সম্মিলিতভাবে গঠন করে সেতু তৈরির ফান্ড। সেতুটি তৈরি ব্যাপারে শিক্ষক আসাদুজ্জামান বলেন, 'আমাদের কারোরই কারিগরী জ্ঞান নেই। গাইতে গাইতে গায়েন এর মতো নিজেদের মাথা খাটিয়ে কাজটি করেছি। তবে মূল কাজটি করেছে রবিউল।'

যার নির্দেশনায় তৈরি হলো এ সেতু

রাজগঞ্জ বাজারে অবস্থিত বিশ্বাস ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ। ওয়ার্কশপটি রবিউল ইসলামের। তেমন স্বচ্ছলতায় কাটেনি রবিউলের শৈশব। অভাব আর অনটনের কারণে মাধ্যমিকের পর আর লেখাপড়া করা হয়নি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেমন না থাকলেও মেধার জোর তার বরাবরই ছিল, এর সাথে ছিল ইচ্ছাশক্তি। তার এই ইচ্ছাশক্তি তীব্র ছিল বলেই স্বশিক্ষায় শিক্ষিত এক ক্ষুদ্র প্রকৌশলীতে পরিণত হয়েছেন। ঝাঁপায় ভাসমান সেতুটি তৈরি হয়েছে তারই নির্দেশনায়। নির্দেশনা বললে হয়ত কিছুটা ভুল হবে, সেতুটির কারিগর তিনি, যেমনটি লেখা আছে সেতুর সাথে লাগানো সাইনবোর্ডটিতে।

যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জের এক অজপাড়ায় থাকেন রবিউল। পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলো না বলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় লেখাপড়া ছেড়ে কাজ নিতে হয় লেদ মেশিনের দোকানে। সেখানে তিনি বিভিন্ন যন্ত্রের ক্ষুদ্রাংশ তৈরির কাজ করতেন। দীর্ঘদিন কাজ শেখার পর তিনি নিজেই ৫০ হাজার টাকা দিয়ে একটি লেদ মেশিন কিনে নেন। মেশিনটি কেনার জন্য তাকে টাকা দেন তার বাবা। এরপর নিজেই একটি হালকা প্রকৌশল শিল্পের ওয়ার্কশপ খোলেন। এখন সেখানে ১০ জন শ্রমিক কাজ করে। এ ১০ জনকে নিয়ে তিনি সেতুটির কাজ করেছেন। এজন্য সময় একটু বেশি (পাঁচ মাস) লেগেছে। ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা তিনি পেয়েছেন সেতুটি নির্মাণের জন্য। তবে তার মতে তাঁর শ্রমের মূল্য এর চেয়েও বেশি। নির্মাণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, *'সেতুটি তৈরির জন্য প্রথমে এক মাস পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়েছে। এরপর আমার প্রতিষ্ঠানের ১০ জন শ্রমিক নিয়ে চার মাস ধরে সেতু নির্মাণের কাজ করি। অর্থের জন্য নয়, সুনামের জন্যই কাজটি করেছি। এখানে লাভ-লোকসানের হিসাব নেই।'*

ঝাঁপা গ্রামবাসীর এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছে সারা দেশের মানুষ। প্রতিদিন বহু মানুষ যাচ্ছে অভিনব এ সেতুটি দেখতে। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো স্বীকৃতি পায়নি গ্রামবাসীর এ উদ্যোগ। দুর্নীতি, গুম, হত্যা, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, ব্যর্থ আন্দোলনের ভিড়ে যখন হতাশাগ্রস্ত এক অন্ধকারে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, তখন আশার আলো জ্বালার মতো স্বস্তিদায়ক একটি সংবাদ ছিল গ্রামবাসীর এ পদক্ষেপ। তারা প্রমাণ করে দিয়েছে, ইচ্ছা করলে নিজেদের সমস্যার সমাধান আমরা নিজেরাই করতে পারি। তবে তাদের এ উদ্যোগ দীর্ঘস্থায়ী কোনো সমাধান নয়। বর্ষা আসলে বাঁওড়ের পানি বাড়ার সাথে সাথে স্রোতও বাড়বে। তখন সেতুটির অবস্থান ও অবস্থা ঠিক রাখা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। আর এ বর্ষা পার করলেও আগামী বর্ষায় কী হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না কাঠামোগত কারণে। গ্রামের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষ যখন নিজ খরচে এমন মহৎ উদ্যোগ নিতে পারে তখন সরকার তো তাদের জন্য একটি স্থায়ী সমাধান দিতেই পারে।

Sakib Sharif
Roar.Media 26 January 2018

চলন বিলের চলন-বলন

বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল চলনবিল। ভরপুর বর্ষায় ডিঙি নৌকা বেয়ে জেলেদের মাছ ধরা, সাদা বকের ধ্যানীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা, দলবেঁধে রাজহাঁস-পাতিহাঁসের ভেসে চলা, পানির আর কচুরিপানার গভীর মিতালি, দ্বীপের মতো জেগে ওঠা বাড়ির আঙিনার ঘাট থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের লাফিয়ে গোসল করা, কৃষকের গরু-মহিষের জন্য ঘাস কেটে কলাগাছের ভেলায় চড়ে বাড়ি ফেরা, আমন-আউশ ধান বাতাসে দোল খাওয়ার দৃশ্যসহ নানা রূপময় দৃশ্য যেন নিমিষেই যে কারও মন-প্রাণ ভরিয়ে দেয়। পাল তোলা কিংবা শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে ঢেউ খেলানো বিল ঘুরেফিরে দেখলেও সে দেখার সাধ কখনও শেষ হওয়ার নয়। বর্ষায় চলনবিলের রূপসী চিত্রাবরণ স্থানীয় লোকজনকে অনাবিল প্রফুল্লতায় ভরিয়ে দেয়।

বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল চলনবিল। ভরপুর বর্ষায় ডিঙি নৌকা বেয়ে জেলেদের মাছ ধরা, সাদা বকের ধ্যানীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা, দলবেঁধে রাজহাঁস-পাতিহাঁসের ভেসে চলা, পানির আর কচুরিপানার গভীর মিতালি, দ্বীপের মতো জেগে ওঠা বাড়ির আঙিনার ঘাট থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের লাফিয়ে গোসল করা, কৃষকের গরু-মহিষের জন্য ঘাস কেটে কলাগাছের ভেলায় চড়ে বাড়ি ফেরা, আমন-আউশ ধান বাতাসে দোল খাওয়ার দৃশ্যসহ নানা রূপময় দৃশ্য যেন নিমিষেই যে কারও মন-প্রাণ ভরিয়ে দেয়। পাল তোলা কিংবা শ্যালোইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে ঢেউ খেলানো বিল ঘুরেফিরে দেখলেও সে দেখার সাধ কখনও শেষ হওয়ার নয়। বর্ষায় চলনবিলের রূপসী চিত্রাবরণ স্থানীয় লোকজনকে অনাবিল প্রফুল্লতায় ভরিয়ে দেয়। শুধু কি তাই? দেশের দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসা হাজার হাজার পর্যটককে নিমিষেই আকর্ষিত করে তোলে।

বর্ষার সৌন্দর্য প্রদর্শনের মধ্যেই চলনবিলের রূপবৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ নয়। বর্ষার পানি যখন নেমে যেতে থাকে, জেগে ওঠে আমন-আউশ ধানের গোড়ালি। জেগে ওঠে আঁকাবাঁকা খণ্ডবিখণ্ড জমির আইল। কোন জমি কার, তা আমার-আপনার বুঝে ওঠার সাধ্য না হলেও কৃষক ঠিকই চিনে নেয়। সেসব ধানের জমিতে দেখা যায় শোল, টাকি, ট্যাংরা, পুঁটি, কৈ ইত্যাদি মাছ। জেলে থেকে শুরু করে সবাই যেন গামছা ভরে মাছ নিয়ে বাড়ি ফেরে। ভাতের চেয়ে মাছই বেশি খায় চলনবিলের মানুষ। বাড়ির আঙিনায় জন্মানো কচি লাউ, কচুরমুখি আর পেঁপে মাছকে করে তোলে আরও সুস্বাদু।

শরতে চলনবিলের নদীরপাড় সাদা কাশফুলে ভরে ওঠে। সারি সারি কাশফুলের দৃশ্য যেন বলে দেয় এটা স্বর্গরাজ্য। কচুরিপানার কোলজুড়ে আসে সাদা সাদা ফুল সন্তান, মাঝখানে কালো-বেগুনি টিপ পরানো থাকে যেন কারও নজর না লাগে। ওদের ত্যাগ-তিতিক্ষার কারণে চলনবিলের জমি উর্বরতা পায়। কখনও কখনও কচুরিপানা গরুর খাদ্যের জন্য কৃষক মাথায় করে নিয়ে যায়। খড়ের বিকল্প হিসেবে কচুরিপানা গরুর উপাদেয় খাদ্য। এরপর হেমন্ত আসতেই পাকা ধান কেটে মহিষের গাড়িতে নিয়ে ঘরে ফেরে কৃষক। ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব চলতে থাকে। নতুন চালের ভাত রান্নার ধোঁয়া গিয়ে লাগে প্রতিবেশীর দরজায়।

চলনবিলের উপরি জমিতে কৃষক রবিশস্যের চাষ করে। রবিশস্যের সবুজাভ দৃশ্য যেন চলনবিলকে চিরসবুজের আধারে পরিণত করে। সরিষার হলুদ ফুলে ফুলে ছুটে চলে মৌমাছি। সেখান থেকে রেণু নিয়ে মৌমাছি মৌচাক বাঁধে ভাগ্যবতী কৃষাণীর বাড়ির আঙিনার ফল গাছে। শীতের আসতে আসতে মৌচাক থেকে আসে মধু। সংগৃহীত মধু দিয়ে খাটো দশ, স্বর্ণা ধানের মুড়ি মাখিয়ে খেতে খেতে কৃষক ছুটে চলনবিলের মাঠে। শীতের আগমনে কৃষকের মনে ভাবনা জাগে, 'জমি চাষ করতে হবে, ধানের চারা রোপণ করতে হবে।' সভ্যতার বির্বতনে চলনবিলে এখন আর গরু-মহিষ দিয়ে হাল চাষ হয় না। পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর দিয়ে বিঘা বিঘা জমি চাষ করে চলনবিলের কৃষক প্রশান্তি পায়। বৈদ্যুতিক মোটর পাম্প, শ্যালোমেশিন, ইঞ্জিনচালিত ডিপমেশিনে গভীর থেকে পানি উত্তোলন করে ধানের চারায় সেচ দিয়ে কৃষক বড় করে তোলে। নিয়মিত সার দেয়, নিড়ানি দেয়।

চলনবিলে দেখা মেলে নানা ধরনের জীবজন্তু, পাখপাখালি। গম, সরিষা, তিল, পাটের জমির আইলে গাঁওরা, শেয়াল দলবেঁধে বিচরণ করে। কখনও এরা চলনবিলের কৃষাণীর পালন করা হাঁস, মুরগি, কবুতরের দিকে আঘাত হানে। সন্ধ্যা নামলে এদের ডাকে মুখরিত হয়ে ওঠে চলনবিলের মাঠ-প্রান্তর। নদীর ধারে দেখা মেলে মেছোবাঘের। কাঁকড়া, মাছ ধরে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। বিকাল হলে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ছুটে চলে বাসার ঠিকানায়। শীতকালে সুদূর সাইবেরিয়া থেকেও আসে পাখি। পানকৌড়ি, মাছরাঙা, বক, শালিক, বুনোহাঁস চলনবিলের প্রতিদিনের অতিথি। এসব জীবজন্তু, পাখপাখালি চলনবিলের জীববৈচিত্র্যের অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচ্য। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এদের ভূমিকা অপরিসীম। মাঝেমধ্যে এদের বুকে আঘাত হানে স্থানীয় শিকারিরা।

চলনবিলের সবুজ-শ্যামল বিশাল মাঠে রাখাল গরু, মহিষ, ভেড়া চড়িয়ে দিন কাটায়। সকালে গরুর দুধ দোহানোর পর দলবেঁধে গরু নিয়ে ছেড়ে দেয় খোলা মাঠে। সবুজ কচি ঘাসে ভরে ওঠে গৃহপালিত পশুর পেট। তৃষ্ণা লাগলে চলনবিলের স্বচ্ছ পানিতে ওরা তৃষ্ণা মেটায়। নিয়মিত কয়েকদিন মাঠে গরু চড়ালে তরতাজা হয়ে ওঠে গরুর শরীর। দুধের গরু দুধ দেয় বেশি বেশি, ষাঁড় হয় মোটাতাজা। অনেকেই মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে বট, হিজল, তালগাছের ছায়ায় বসে আপন মনে গান গায়, বিশ্রাম নেয়, গ্রাম্য নানা খেলাধুলা করে। অনেকে আবার গরু মাঠে রেখে স্থানীয় বাজার থেকে বাড়ির জন্য কেনাকাটা করে আনে। প্রত্যেক কৃষকের ঘরে রয়েছে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ। কৃষি ও মৎস্যের পাশাপাশি এটি বিকল্প আয়ের পথ।

বর্ষাকালে বৃষ্টি শুরু হলে চলনবিলের জমির আইলে দেখা যায় শামুক। কোনো কোনো শামুক সাদা ডিমে ভরে জমির আইলের গোপন গর্ত। সাপ, ব্যাঙ চলনবিলের প্রকৃতিতে বিচরণ করে যেন স্বস্তি পায়। এদের আঘাত করার মতো বৈচিত্র্যময় অভয়ারণ্যে কেউ নেই। বিলের প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছে হাজারও প্রজাতির কীটপতঙ্গ। পানিতে যখন শাপলা ফুল ভাসে, তখন দেখা মেলে নানা রঙের, আকারের পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ। আপন মনে খেলে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোলে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান সভ্যতার কুঠারাঘাতে চলনবিলকে ভেদ করে তৈরি হচ্ছে ইট-পাথরের রাস্তা, শুকিয়ে ফেলা হচ্ছে নদী-নালা-খাল। নৌকা চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বড় বড় স্থাপনার ভিড়ে হারিয়ে যেতে চলেছে সবুজ অরণ্য। কমে গেছে গাছের সংখ্যা। এমনভাবে চলতে থাকলে চলনবিলকেন্দ্রিক জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়বে।

সভ্যতা যতই সমৃদ্ধ ও আধুনিক হোক না কেন, চলনবিলের জীববৈচিত্র্য, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে কখনোই বিসর্জন দিয়ে নয়। চলনবিলের বুকজুড়ে জেগে থাকা হাজার প্রাণিকুলের নির্মোহ আবেদননামা, 'রক্ষা হোক চলনবিলের রূপবৈচিত্র্য, জীববৈচিত্র্য, বর্ষায় অথৈ পানিতে ভরে উঠুক বিল, ফুটুক শাপলা, পানির গতিতে বাধা না আসুক, সারি সারি নৌকায় জেলেরা মাছ ধরুক, চৈত্রের দাবদাহে ইরি-বোরো ধান কেটে ঘরে ফিরুক কৃষক। আঁকাবাঁকা রাস্তায় চলুক ধানের আঁটি ভর্তি গরুর গাড়ি। সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির অপূর্ব সম্মোহনে বেঁচে থাকুক চলনবিলের সহজ-সরল মানুষ।'

মোহাম্মদ অংকন
দৈনিক যুগান্তর ১২ অক্টোবর ২০১৯
লেখক : কলামিস্ট ও শিশু সাহিত্যিক

গুপী গাইন বাঘা বাইন
নট আউট ফিফটি

১৯৬৯ সালের ৮ মে মুক্তি পায় সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা গুপী গাইন বাঘা বাইন। এ বছর পূর্ণ হলো সেই বিখ্যাত সিনেমার পঞ্চাশ বছর। উপেন্দ্রকিশোরের 'গুপী গাইন' গল্পের সঙ্গে অনেকখানি পার্থক্য রেখেছিলেন সত্যজিৎ রায় তার এ ছবিতে। উপেন্দ্রকিশোরের গল্প থেকে শিশু ফ্যান্টাসির সঙ্গে এ ছবিতে মিশ্রণ ছিল বাস্তবতার।

গল্পের প্রধান দুই চরিত্র গুপী আর বাঘা। দুজনেই গান বলতে পাগল, গান গাওয়ার প্রবল আগ্রহ তাদের দুজনের ভিতর। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা আগ্রহ দিলেও দুজনকেই রেখেছেন সাংগীতিক প্রতিভাবান। রাজার বাড়ির সামনে সাতসকালে বেসুরো গান গাওয়ার কারণে আমলকী গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয় গুপী। তৃতীয় সুর, ষষ্ঠ সুর... গুপী চলল বহু দূর। গাধার পিঠে চড়ে গ্রামতাড়িত হয়ে কোনো এক বাঁশঝাড়ের মাঝে গুপীর দেখা হয় হরতুকী গ্রামের অধিবাসী বাঘার সাথে যারও ঢোল বাজাতে গিয়ে তার মতোই দশা। তাদের দুর্দশা দেখে সেই বাঁশঝাড়ে ঘুমের মাঝে তাদের সাথে দেখা করেন ভূতের রাজা আর দেন তিন বর। দুজনে হাততালি দিয়ে ১. ইচ্ছেমতো খেতে-পোশাক পরতে পারা ২. যেখানে খুশি যেতে পারা ৩. গুপীর গলায় ও বাঘার ঢোলে গানের সুর ফিরিয়ে দেয়া, শ্রোতাদের গান শুনিয়ে অবশ করে দেওয়ার ক্ষমতা পায় তারা। ভাগ্যক্রমে এবার দুজনে মিলে শুন্ডী রাজ্যের রাজাকে গান শুনিয়ে তাঁর সভাগায়ক হয়ে সেখানেই পাকাপোক্ত স্থান নেয়। কিন্তু শুন্ডীর বিরুদ্ধে শুন্ডীর রাজারই আপন ভাই হাল্লার রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধ থামাতে গুপ্তচরের বেশে হাল্লায় যায় দুজন ও হাল্লার রাজা, মন্ত্রীদের সততা, সঙ্গীত ও বুদ্ধি দিয়ে দিয়ে পরাস্ত করে যুদ্ধ থামিয়ে দেয় তারা। পরিশেষে দুই রাজার মেয়েকে বিয়ে করে রাজার জামাই বনে যায় তারা। শুন্ডীর রাজকন্যা মণিমালাকে স্ত্রী হিসেবে পায় গুপী আর হাল্লার রাজকন্যা মুক্তামালার সঙ্গে জুটি হয় বাঘার। উপেন্দ্রকিশোরের 'গুপী গাইন' গল্পের সঙ্গে অনেকখানি পার্থক্য রেখেছিলেন সত্যজিৎ রায় তার এ ছবিতে। উপেন্দ্রকিশোরের গল্প থেকে শিশু ফ্যান্টাসির সঙ্গে এ ছবিতে মিশ্রণ ছিল বাস্তবতার। গল্পে যেখানে ছিল গুপী চালাক, বাঘা একটু সাধাসিধে। হাল্লা রাজা ভালো, শুন্ডী দুষ্টু। ছবিতে এর পুরোটাই উল্টো। মূলত ছোটদের জন্য নির্মাণ করা হলেও গুপী গাইন বাঘা বাইন যেকোনো বয়সের দর্শকদের জন্যই সমানভাবে উপভোগ্য।

ছবির অন্যতম আকর্ষণ সত্যজিৎ রচিত গানগুলি। ভূতের রাজা দিল বর, মহারাজা তোমারে সেলাম, ও মন্ত্রী মশাই, এক যে ছিল রাজা...ছবির গানগুলো যেন একটা থেকে আরেকটা সেরা। গুপীর কণ্ঠে অধিকাংশ গানগুলোই গেয়েছেন অনুপ ঘোষাল আর অসাধারণ সঙ্গীতায়োজন সত্যজিৎ রায়ের নিজেরই।

ছবিটি প্রথম প্রযোজনা করার কথা ছিল আর ডি বনশলের। রাজনীতির ডামাডোলে সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। চেষ্টা করে ফিল্ম ফিন্যান্স কর্পোরেশনকেও রাজি করানো যায়নি। এরপর প্রযোজক হিসেবে এগিয়ে আসেন মুম্বাইয়ের বিখ্যাত অভিনেতা প্রযোজক রাজ কাপুর। তবে তার ছিল একটাই শর্ত, ছবির মুখ্য দুই ভূমিকায় অর্থাৎ গুপী হবেন পৃথীরাজ কাপুর, বাঘা শশী কাপুর। নিজ পছন্দের বাইরে একচুলও আপস করতে নারাজ সত্যজিৎ রায় সেই প্রস্তাব তখনই বাতিল করে দেন। অবশেষে যোগাযোগ হয় নেপাল দত্তের সাথে। পূর্ণিমা পিকচারস থেকে ছবিটি অবশেষে প্রযোজনা করেন নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত।

ওদিকে ছবির চরিত্রায়ন নিয়েও অনেক গল্প রয়েছে। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' সিনেমার জন্য নাকি প্রথমে কিশোর কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কেই ভেবেছিলেন মানিকবাবু (সত্যজিৎ রায়)। কিন্তু পরে পিছিয়ে আসেন তিনি কারণ ততদিনে নাকি কিশোর কুমারের ওজন অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল যা চরিত্রের জন্য মামানসই ছিল না। শেষমেষ গুপী বাঘা চরিত্রে ছবিতে টিকে যান তপেন চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। শুন্ডী ও হাল্লার রাজা দ্বৈত চরিত্রে পর্দায় দেখা যায় জটায়ু খ্যাত সন্তোষ দত্তকে। মজার বিষয় হলো ছবিতে ভূতের রাজা চরিত্রের কণ্ঠদান করেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়।

১৯৬৮ এর জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল ছবিটির শুটিং। বাঁশঝাড়ে বাঘের দৃশ্য, হাতে তালি দিয়ে হুন্ডী-ঝুন্ডী-শুন্ডীর যাওয়া দেখাতে গিয়ে সিমলা, জয়সলমীর চলে যাওয়া, হাল্লার যুদ্ধে আকাশ থেকে মিষ্টিবর্ষণ নিয়ে বিস্তারিত গল্প রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের নিজ হাতে লেখা বই 'একেই বলে শুটিং' এ। জানুয়ারিতে শুরু ছবির কাজ শেষ হয় সেই বছরের ডিসেম্বরে। পরের বছর জানুয়ারিতে ছবিটির মুক্তির কথা থাকলেও সপ্তাহের পর সপ্তাহ পেছাতে থাকে ছবি মুক্তির তারিখ। কিন্তু ওদিকে বার্লিন এবং মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসব থেকে ছবিটি প্রদর্শনের অনুরোধ আসে। অনেক টালবাহানার পর ১৯৬৯ সালের ৮ মে পশ্চিমবঙ্গের মিনার, বিজলী, ছবিঘর, গ্লোবে মুক্তি পায় সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। ছবিটি মেলবোর্ন, অ্যাডেলেইড, টোকিও, অকল্যান্ডের পুরস্কারসহ ভারতীয় অনেকগুলো চলচ্চিত্র পুরস্কার নিজের করে নেয়।

হিন্দি ভাষায় অ্যানিমেশনের মাধ্যমে রিমেক করা হয়েছিল এ ছবিটির। 'গুপী গাইয়াইয়া বাঘা বাজাইয়া' নামে ওই চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেন শিল্পা রানাডে। এছাড়াও মঞ্চে অসংখ্যবার মঞ্চায়িত হয়েছে এটি। বাংলাদেশে প্রাচ্যনাট স্কুল অব অ্যাক্টিং অ্যান্ড ডিজাইনের প্রযোজনায় মঞ্চায়িত হয়েছে গুপী গাইন বাঘা বাইন।

ইরাবতী ডেস্ক
৮ মে ২০১৯

ট্রয় নগরী
শুধুই কি উপকথা নাকি ইতিহাস?

হোমারের বর্ণিত এই গল্পের সত্যতা বর্তমান পৃথিবী জানে না। কিন্তু ট্রোজান যুদ্ধ এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে, ইতিহাস বা শ্রুতিকথা যা-ই হোক না কেন, তা আজ মিলে মিশে একাকার। পরবর্তীতে অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেট, জুলিয়াস সিজারের মতো মহারথীরাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন এই ট্রোজান যুদ্ধ থেকে।

কম্পিউটার যারা ব্যবহার করেন, তারা একবার হলেও ট্রোজান ভাইরাসের সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু ক'জন জানেন সেই বিখ্যাত ট্রোজান হর্সের গল্প? ট্রোজান যুদ্ধ, যেখানে গ্রিকদের হাতে পরাজিত হয় ট্রয় নগরী। হেলেনের সৌন্দর্য, হেক্টর এবং অ্যাকিলিসদের বীরত্ব, গ্রিকদের ধূর্ততা, দেব-দেবী সবকিছু মিলিয়ে ট্রোজান যুদ্ধের গল্প অবিশ্বাস্য মনে হলেও প্রায় ৩ হাজার বছর পরেও মানুষকে কৌতূহলী করে তোলে। তবে এখনো প্রশ্ন থেকে যায়, ট্রয় নগরী কি আসলেই এ পৃথিবীতে ছিল? নাকি তা শুধুই একটি গ্রিক শ্রুতিগল্প?

ট্রয় নগরী এবং ট্রোজান যুদ্ধের কথা আমরা জানতে পারি প্রাচীন গ্রিক লেখক হোমার এর অনবদ্য সৃষ্টি 'ইলিয়াড' এবং 'ওডেসি' থেকে। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ খুঁজে পান প্রাচীন বিশ্বের হারিয়ে যাওয়া সেই ট্রয় নগরী। বর্তমান তুরস্কের একপ্রান্তে অবস্থিত 'হিসারলিক'কে তৎকালীন ট্রয় নগরী বলে ধারণা করা হয়।

ব্রোঞ্জ যুগের এক প্রসিদ্ধ শহর ট্রয়। এজিয়ান সাগরের উপকূলে অবস্থিত এ শহর জড়িয়ে আছে মানব সভ্যতার সূচনা এবং বিস্তারের সঙ্গে। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সালের দিকে গড়ে ওঠে এ নগরী। বর্তমান এশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের তৎকালীন যোগাযোগের মাধ্যম ছিল ট্রয়। ব্রোঞ্জ যুগে পশ্চিম এবং পূর্ব বিশ্বের ব্রোঞ্জের পরিবহনের পথ ছিল এটি। বাণিজ্যিক প্রসিদ্ধির সাথে সাথে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক এই নগরীও।

ট্রয় যখন উন্নতির শিখরে, চারদিকে তখন গ্রিকদের রাজত্ব। স্বাভাবিকভাবেই গ্রিকরা ট্রয় দখল করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং এখান থেকে হোমারের গল্পের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে ওঠে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম এক যুদ্ধের সঙ্গে। ইতিহাসে এই যুদ্ধ পরিচিত ট্রোজান যুদ্ধ নামে, যা স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘ দশ বছর।

হোমার তাঁর 'ইলিয়াড' এবং 'ওডেসি' রচনা করেন বীরযোদ্ধা অ্যাকিলিস ও রাজা অ্যাগামেমনন এবং তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, ট্রোজান যুদ্ধ বাস্তব ঘটনা। হোমার এমন এক বংশ থেকে এসেছেন যারা গীতের মাধ্যমে ইতিহাস মনে রাখতেন। হোমার হয়তো তাদের একজন এবং তিনি তার গীতি গল্পকে প্রথম অক্ষরের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

গল্পের শুরু হয় অ্যাকিলিসের পিতা মিরমিডোন্স এর রাজা পিলিয়াস এবং গ্রিক দেবী থেটিসের বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করা হলেও 'ইরিস', দ্বন্দ্বের দেবীকে নিমন্ত্রণ করা হয় না। ইরিস তবুও অনুষ্ঠানে আসেন। তিনি একটি সোনালি আপেল সঙ্গে আনেন, যাতে লেখা ছিল 'সব থেকে সুন্দরীর জন্য'। তিন দেবী হেরা, এথিনা এবং এফ্রোডাইটি আপেলটি দাবী করেন এবং জিউসকে বিচারক হবার আহবান জানান। কিন্তু জিউস অসম্মতি জানান এবং ট্রয়ের সুদর্শন রাজকুমার প্যারিসকে এ দায়িত্ব দেন। প্যারিস এফ্রোডাইটিকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। এফ্রোডাইটি প্যারিসকে পৃথিবীর সুন্দরীতম রমণী দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দরী রমণী হেলেন ছিলেন অ্যাগামেমননের ভাই স্পার্টার মেনালাউসের স্ত্রী।

প্যারিস বাণিজ্যিক কাজে স্পার্টা ভ্রমণে যান এবং সেখান থেকে হেলেনের সঙ্গে পালিয়ে ট্রয়ে ফিরে আসেন। মেনালাউস তার স্ত্রী এবং গ্রিকদের সম্মান ফিরিয়ে আনতে তার ভাই মাইসিনির অ্যাগামেমননের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অ্যাগামেমনন সহজে রাজি হয়ে যান, কেননা এর মাধ্যমে ট্রয়কে গ্রিক সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে জয় করার সম্ভাবনা ছিল।

অ্যাগামেমনন অন্যান্য গ্রিক রাজাদের একত্রিত করেন এবং প্রায় এক হাজার জাহাজ নিয়ে ট্রয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। গ্রিকদের যাত্রাপথে বাধা হন দেবতা আর্টেমিস। সমুদ্রের বাতাস থেমে যায় আর্টেমিসের অভিশাপে। দেবতাকে খুশি করতে অ্যাগামেমনন তার নিজ কন্যা ইফিজিনিয়াকে হত্যা করেন উৎসর্গ হিসেবে। কেউ কেউ বলেন, ইফিজিনিয়ার সঙ্গে অ্যাকিলিসের বিয়ে হবার কথা ছিল। আর্টেমিস এতে তার অভিশাপ তুলে নেন এবং গ্রিক সৈন্যবাহিনী অ্যাগামেমননের নেতৃত্বে ট্রয়ে পৌঁছায়।

কিন্তু দীর্ঘ দশ বছরে তারা ট্রয়ের দেয়াল ভেদ করতে পারেনি। যুদ্ধের শেষ বছরে অ্যাগামেমনন এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা অ্যাকিলিসের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এর ফলে অ্যাকিলিস যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। এ সময় প্যাট্রোক্লাস অ্যাকিলিসের বর্ম পরে যুদ্ধে যান এবং হেক্টরের হাতে নিহত হন। প্যাট্রোক্লাস অ্যাকিলিসের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। হোমার ইলিয়াডে তাদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক তুলে ধরলেও প্লেটো এবং অন্যরা তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক তুলে ধরেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে অ্যাকিলিস হেক্টরের সাথে যুদ্ধের আহবান জানান এবং হেক্টর পরাজিত হন। অ্যাকিলিস হেক্টরের মৃতদেহ টেনে তাদের শিবিরে নিয়ে আসেন। তৎকালীন ট্রয়ের রাজা এবং হেক্টরের পিতা প্রিয়াম রাতের অন্ধকারে অ্যাকিলিসের সাথে একা সাক্ষাৎ করেন এবং তার সন্তানের দেহ ফেরত দেওয়ার অনুরোধ জানান। অ্যাকিলিস রাজি হন এবং ১১ দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন।

এর মধ্যে ওডেসিয়াস একটি কাঠের ঘোড়া তৈরির বুদ্ধি বের করেন। একটি বিরাট কাঠের ঘোড়া, যার ভেতরে গ্রিক সৈন্যরা অবস্থান নেন। ঘোড়াটি তীরে রেখে গ্রিকরা ফিরে যায়। ট্রোজানরা ভাবে ঘোড়াটি তাদের জন্য উপহার হিসেবে রেখে গিয়েছে গ্রিকরা। ট্রোজান সৈন্যরা তাদের দেয়াল ভেঙে ঘোড়াটিকে শহরে নিয়ে যায়। রাতে যখন তারা তাদের বিজয় উদ্‌যাপনে মত্ত থাকে তখন ঘোড়ার ভেতর থেকে গ্রিক সৈন্যরা বের হয়ে আসে এবং শহরের ফটক খুলে দেয় অন্যান্য গ্রিক সৈন্যদের প্রবেশের জন্য, যারা আসলে ফিরে না গিয়ে সমুদ্রে অপেক্ষারত ছিল। এভাবে তারা জয় করে ট্রয় নগরী। প্রিয়ামকে হত্যা করা হয়। হেক্টরের শিশু সন্তানকে ট্রয়ের দেয়াল থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেলা হয়। অ্যাকিলিস নিহত হন প্যারিসের ছোড়া তীরে। এভাবে শেষ হয় দীর্ঘ দশ বছরের ট্রোজান যুদ্ধ।

যুদ্ধ শেষে গ্রিকদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন খুব একটা সহজ হয় না। দশ বছর সমুদ্রে ঘুরে হেলেনকে নিয়ে নিজ দেশে ফেরেন মেনালাউস। মেনালাউস হেলেনকে হত্যা করতে চাইলেও তার সৌন্দর্যের কাছে পরাজিত হন। অ্যাগামেমনন নিজ দেশে ফিরে প্রথম রাতেই নিহত হন তার স্ত্রীর প্রেমিকার দ্বারা।

মেনালাউসের মতোই দশ বছর ঘুরে দেশে ফেরেন ওডেসিয়াস।

হোমারের বর্ণিত এই গল্পের সত্যতা বর্তমান পৃথিবী জানে না। কিন্তু ট্রোজান যুদ্ধ এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে, ইতিহাস বা শ্রুতিকথা যা-ই হোক না কেন, তা আজ মিলে মিশে একাকার। পরবর্তীতে অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেট, জুলিয়াস সিজারের মতো মহারথীরাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন এই ট্রোজান যুদ্ধ থেকে। অ্যালেক্সান্ডার যেমন নিজেকে মিলিয়েছেন গ্রিক বীর অ্যাকিলিসের সঙ্গে, তেমনি জুলিয়াস সিজার নিজেকে তুলনা করেছেন ট্রোজান বীর এনিয়াসের সঙ্গে।

ট্রোজান যুদ্ধের গুরুত্ব অনেক বেশি, কারণ এ যুদ্ধের মাধ্যমে মানব সভ্যতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। হোমারের ইলিয়াড এবং ওডেসির মাধ্যমে প্রথম গ্রিক সাহিত্য সৃষ্টি হয়। এ কারণে গ্রিক বর্ণমালার সূচনা হয় যা পরবর্তীতে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এ যুদ্ধ ধূর্ততা, বীরত্ব, দেশপ্রেম, ভালোবাসার মতো বিষয়কে প্রকটভাবে ফুটিয়ে তোলে। ৩,০০০ বছর পূর্বের এ যুদ্ধ হতে পারে বাস্তবতা অথবা শুধুই একজন লেখকের সৃষ্ট এক গল্প। যেটাই হোক না কেন, আজ তা আর বিবেচ্য নয়। মানব সভ্যতার সঙ্গে মিশে আছে ট্রয়।

Sadman Sakib
roar.media/bangla 4 November 2019

বিনামূল্যে উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্বের সেরা ৮টি শিক্ষাবৃত্তি

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ১৫০০ জন শিক্ষার্থী এ স্কলারশিপের অধীনে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকেন । এই বৃত্তির আওতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়াশোনা করার সুযোগ রয়েছে । এছাড়াও মাসিক ভাতা বিমান ভাড়া ও নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে ।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই স্বপ্ন রয়েছে দেশের বাইরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার । কিন্তু বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়া বেশ ব্যয়বহুল ব্যাপার । অনেকের পক্ষেই দেশের বাইরে গিয়ে পড়াশোনা ও জীবন যাত্রার খরচ বহন করা সম্ভব হয় না । এ কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনের স্বপ্ন কখনো বাস্তবে পরিণত হয় না । তবে বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন তরুণ শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে । বলার অপেক্ষা রাখে না, যেকোনো শিক্ষার্থীর জন্য স্কলারশিপ আশীর্বাদস্বরূপ । আজকের নিবন্ধে আমরা বিশ্বের সেরা ৮টি শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো আপনাকে প্রায় বিনামূল্যে বিদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনে পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তাও প্রদান করবে ।

১. ইরাসমুস মুন্ডুস (ইউরোপ)

উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দ ইউরোপের উন্নত দেশসমূহ । ইউরোপের

দেশগুলোতে উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে চাইলে আবেদন করতে পারেন ইউরোপিয়ান কমিশন প্রদত্ত 'ইরাসমুস মুন্ডুস' স্কলারশিপের জন্য। এই স্কলারশিপের মূল উদ্দেশ্য উচ্চতর শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানো এবং শিক্ষাগত সহযোগিতার মাধ্যমে জনগণ ও সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ এবং বোঝাপড়া বৃদ্ধি করা।

সিভি, একাডেমিক যোগ্যতা, মোটিভেশন ও রেকোমেন্ডেশন লেটার, ভাষা দক্ষতা ইত্যাদির ভিত্তিতে ইউরোপীয় কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচন কমিটির সদস্যরা স্কলারশিপের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করে থাকেন। 'ইরাসমুস মুন্ডুস' স্কলারশিপের অধীনে টিউশন ফি, জীবনযাত্রার অর্ধেক খরচ, বিমান খরচ, লাইব্রেরি ফি, পরীক্ষা ফি, গবেষণা সংক্রান্ত ফি সব খরচ বহন করা হয়। এছাড়াও প্রতিটি মাস্টার্স ও পিএইচডি কোর্সের ক্ষেত্রে একাধিক দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তি থাকায় এই স্কলারশিপের অধীনে শিক্ষার্থীরা কোর্স চলাকালে ন্যূনতম দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ পাবেন।

২. কমনওয়েলথ মাস্টার্স স্কলারশিপ (যুক্তরাজ্য)

কমনওয়েলথ মাস্টার্স স্কলারশিপ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ প্রদান করে থাকে। স্কলারশিপটি ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) দ্বারা অর্থায়িত হয়।

বৃত্তিটি প্রতিভাবান এবং উদ্যমী শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করতে সহায়তা করে থাকে। বৃত্তির আওতায় একজন শিক্ষার্থী পাবেন বিনা টিউশন ফিতে যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়ার সুযোগ। এছাড়াও আবাসন ও বসবাসের আনুষঙ্গিক খরচ এবং বিমানে যাতায়াত খরচও বহন করা হয়।

৩. এন্ডেভার পোস্ট পোস্টগ্রাজুয়েট অ্যাওয়ার্ডস (অস্ট্রেলিয়া)

উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে পছন্দের প্রথম তালিকায় রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, এর প্রধান কারণ অবশ্যই অস্ট্রেলিয়ার উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা। যে সকল শিক্ষার্থী মাস্টার্স বা পিএইচডি কোর্সের জন্য অস্ট্রেলিয়া যেতে চান, তারা 'এন্ডেভার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অ্যাওয়ার্ডস' নামক শিক্ষাবৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারেন। এ স্কলারশিপের আওতায় রয়েছে বিনামূল্যে পড়াশোনা করার সুযোগ এছাড়াও ভ্রমণ ভাতা, মাসিক ভাতা এবং স্বাস্থ্য বীমাসহ পূর্ণ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৪. শেভেনিং স্কলারশিপ (যুক্তরাজ্য)

যুক্তরাজ্য সরকারের একটি গ্লোবাল স্কলারশিপ প্রোগ্রাম ব্রিটিশ 'শেভেনিং স্কলারশিপ'। ১৯৮৩ সালে এই বৃত্তি কার্যক্রম শুরু হয়। এতে অর্থায়ন করে ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস বা এফসিও। যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা এ স্কলারশিপের অধীনে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ১৫০০ জন শিক্ষার্থী এ স্কলারশিপের অধীনে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকেন। এই বৃত্তির আওতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়াশোনা করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও মাসিক ভাতা বিমান ভাড়া ও নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে চাইলে আপনার দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং কোর্স শেষ হওয়ার দু বছরের মধ্যে নিজ দেশে ফিরে আসার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

৫. ফুলব্রাইট স্কলারশিপ (যুক্তরাষ্ট্র)

যুক্তরাষ্ট্রের ফুলব্রাইট স্টুডেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় বিশ্বের ১৫৫টি দেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় ৪ হাজার শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাস্টার্স এবং পিএইচডি ডিগ্রি লাভের সুযোগ পান। ১৯৪৬ সালের ১ আগস্ট ফুলব্রাইট বৃত্তি কার্যক্রম শুরু হয়। এই প্রোগ্রামের আওতায় টিউশন বিমান যাতায়াত ভাড়া, বসবাসের জন্য মাসিক ভাতা এবং স্বাস্থ্য বীমা বহন করা হয়।

৬. আইফেল এক্সেলেন্স স্কলারশিপ (ফ্রান্স)

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার পরেই সারা বিশ্বের ছাত্রছাত্রীদের শীর্ষ পছন্দের দেশ ফ্রান্স। শিক্ষা ও গবেষণায় ফ্রান্সের বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিদেশি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য আকৃষ্ট করতে ফরাসি সরকার বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে। এর মধ্যে 'আইফেল এক্সেলেন্স স্কলারশিপ' অন্যতম। ফ্রান্সে মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে চাইলে 'আইফেল এক্সেলেন্স স্কলারশিপ' এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এই স্কলারশিপের অধীনে শিক্ষার্থীদের মাসিক ভাতা হিসেবে ১,১৮১ ইউরো প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিমান ভাড়া ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৭. সুইডিশ ইন্সটিটিউশন স্টাডি স্কলারশিপ (সুইডেন)

'সুইডিশ ইন্সটিটিউশন স্টাডি স্কলারশিপ' এর অধীনে বিশ্বের মোট ৫৫০ জন বিদেশি শিক্ষার্থীদের সুইডেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভের সুযোগ পান। এ শিক্ষাবৃত্তির আওতায় টিউশন ফি, জীবন যাত্রার খরচ, আংশিক যাতায়াত খরচ ও বীমা খরচ বহন করা হয়।

৮. যৌথ জাপান বিশ্ব ব্যাংক গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ (গ্লোবাল)

বর্তমানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীদের কাছে জাপানের নাম তালিকার শীর্ষের দিকেই থাকে। যেসকল শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য জাপানকে বেছে নিতে ইচ্ছুক তারা 'যৌথ জাপান বিশ্ব ব্যাংক গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ' এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এ শিক্ষাবৃত্তির অধীনে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি, মাসিক ভাতা, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য বীমা খরচ বহন করে থাকে।

Youth Carnival
bbc.com ৪ ডিসেম্বর ২০১৮

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক পরামর্শ

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতির শুরুতেই যে বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হবে–

১. প্রথমেই বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস থেকে ছয়টি বিষয়ের নম্বর বণ্টন ও বিষয়ভিত্তিক টপিকগুলো চোখ বুলিয়ে নিন। সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) ওয়েবসাইট (www.bpsc.gov.bd) থেকে লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস (৩৫তম বিসিএসের সিলেবাসই এখন পর্যন্ত চলছে, এরপর আর নতুন সিলেবাস হালনাগাদ হয়নি) ডাউনলোড করতে পারবেন।

২. এক বা দুই সেট যেকোনো প্রকাশনীর গাইড বই দেখে সিলেবাসের বিষয়ভিত্তিক টপিকগুলো ক্লিয়ার করে নিতে পারেন। শিক্ষাজীবনের বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বইগুলো মিলিয়ে গাইড বই লিখা হয়। তিন-চার মাসে বা অল্প সময়ে লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে এটি সহায়ক হবে।

মৌলিক প্রস্তুতির জন্য যে বইগুলো সহায়ক হবে–

- বাংলা, বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক–এই তিন বিষয়ের জন্য অ্যাসিওরেন্স বা প্রফেসরস প্রকাশনীর বই।
- ইংরেজির জন্য অ্যাসিওরেন্স বা মিলারস পাবলিকেশন্সের বই।
- গণিত ও বিজ্ঞানের জন্য ওরাকল প্রকাশনীর বই।
- আরিফ খানের সংবিধানের ব্যাখ্যামূলক বই, মো. আব্দুল হালিমের সংবিধানসংক্রান্ত বই এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' বইটি নিতে পারেন।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা (চলতি বছর), দৈনিক সংবাদপত্র ও অন্যান্য বিষয়-সংশ্লিষ্ট রেফারেন্স বই থেকে যত বেশি তথ্য-উপাত্ত নিতে পারবেন, আপনার লেখা ততই সমৃদ্ধ হবে।

৩. প্রতিটি বিষয়ের গাইড বই পড়া শেষ হলে অন্যান্য টেক্সট বা রেফারেন্স বইয়ে মন দিন। এরপর নিজের লেখার মানকে উন্নত করতে টপিক-সংশ্লিষ্ট গ্রাফ, চার্ট, উক্তি, রেফারেন্স যাতে যুক্ত করা যায়, সেভাবে প্রস্তুতি নিন।

৪. সিলেবাসের বড় পরিসর দেখে হাল ছেড়ে দেবেন না। পুরো সিলেবাস ৫০-৬০ দিনে ভাগ করে একদিক থেকে পড়া শুরু করুন। বিগত চারটি বিসিএস পরীক্ষা বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফলের পর লিখিত পরীক্ষার জন্য কমপক্ষে তিন মাস সময় পাওয়া যায়। প্রতিদিন সে অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে পড়তে থাকুন।

৫. প্রিলির মতো লিখিত পরীক্ষার বেলায়ও বিভিন্ন প্রকাশনীর ডাইজেস্ট বের হয়। লিখিত প্রস্তুতির শেষের দিকে ডাইজেস্টের প্রশ্নগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন, বিশেষ করে যেসব ঘটনা সম্প্রতি ঘটে গেছে। তবে ডাইজেস্টকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে গিয়ে যেন গুরুত্বপূর্ণ অন্য বিষয়গুলো ছুটে না যায়!

৬. ইংরেজি, গাণিতিক যুক্তি এবং সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর জোর দিলে তুলনামূলক বেশি নম্বর পেয়ে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকা সম্ভব হবে। অন্য বিষয়গুলোতে প্রায় সবার নম্বর মোটামুটি কাছাকাছি থাকে। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্রে বাংলা ভার্সনের পরিবর্তে ইংরেজি ভার্সনের ব্যবহার আপনার দক্ষতা ফুটিয়ে তুলবে এবং ভালো নম্বর পেতে সহায়ক হবে।

৭. ইংরেজির প্রস্তুতিতে নিয়মিত ফ্রি-হ্যান্ড রাইটিং অনুশীলন করবেন। এর পর একজন ইংরেজি এক্সপার্টকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নিতে পারলে ভালো হয়। দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় অংশের পাশাপাশি অনলাইন নিউজ পোর্টালের বাংলা ও ইংরেজি খবর দেখে অনুবাদ চর্চা করতে পারেন।

৮. উত্তরপত্রে আপনার লেখা হতে হবে তথ্যবহুল। যেমন–একটি বিষয়ের গুরুত্ব আলোচনা করার সময় স্কুল-কলেজ লেভেলের মতো গতানুগতিকভাবে না লিখে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক গুরুত্বগুলো গবেষণাধর্মী তথ্য, উপাত্ত ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে।

৯. লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে আপনার জ্ঞানের চেয়ে সৃজনশীলতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। তাই যত বই বা সূত্র থেকে যত বিশেষভাবে তথ্য উপস্থাপন করতে পারবেন, প্রতিযোগিতায় আপনি ততই এগিয়ে থাকবেন।

১০. প্রেজেন্টেশনের জন্য কালো কালির পাশাপাশি কোটেশন লিখতে নীল কালি ব্যবহার করতে পারেন; স্কেলিং, গ্রাফ, চার্ট অবশ্যই পেনসিল দিয়ে করবেন। হাতের লেখা সুন্দর হলে ভালো, না হলে উত্তরপত্র পরিপাটি রাখার চেষ্টা করবেন।

১১. লিখিত পরীক্ষায় 'সময় বণ্টন' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় প্রতি নম্বরের জন্য ১.২০ মিনিট এবং ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় প্রতি নম্বরের জন্য ১.৮০ মিনিট করে সময় পাবেন। এভাবেই প্রতিটি প্রশ্নের নম্বরের দিকে লক্ষ রেখে তার জন্য সময় বরাদ্দ করবেন।

১২. বাসায় বসে কিংবা কোনো কোচিংয়ে নিয়মিত মডেল টেস্ট দিয়ে হাতের লেখার গতি বাড়ান। আপনি কতটুকু পড়লেন বা জানলেন তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে–আপনি কতটুকু লিখতে পারলেন। লিখিত পরীক্ষায় পাঁচ দিনে ২১ ঘণ্টা লিখতে হয়। বুঝতেই পারছেন, ফাস্ট হ্যান্ড রাইটিং এবং শারীরিক সক্ষমতা কতটা দরকার!

■ রবিউল আলম লুইপা
দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৮ আগস্ট ২০১৯

প্রকল্প সংবাদ

মেধা লালন প্রকল্প'র ২০১৯ ব্যাচের চূড়ান্ত বাছাই সম্পন্ন

সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ প্রদানের জন্য মেধা লালন প্রকল্প'র নতুন ব্যাচের সদস্যদের চূড়ান্ত বাছাই সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৯ ব্যাচের নব-নির্বাচিত সদস্যদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রমিক	ফরম নং	ছাত্রীদের তালিকা
১.	৬১.	ফারজানা ইয়াসমিন ঋতু, দাকোপ, খুলনা।
২.	৪৭.	মেহের আফরোজ, মিঠাপুকুর, রংপুর।
৩.	৯১.	মোছা. ফাহমিদা শশী, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।
৪.	৬০.	উর্মি বালা, দাকোপ, খুলনা।
৫.	১৮.	মোছা. জাকিয়া আক্তার জেসমিন, মিঠাপুকুর, রংপুর।
৬.	৯২.	জাইবা জাফরিন নুভা, জয়পুরহাট।
৭.	২৩.	মোছা. খায়রুন নাহার অনন্যা, মিঠাপুকুর, রংপুর।
৮.	১৩০.	মোসা. আফরোজা খাতুন, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
৯.	১৪৭.	মোছা. লাবন্য আক্তার মনিরা, মিঠাপুকুর, রংপুর।
১০.	৬৬.	মোছা. মেঘলা আক্তার মুন, মিঠাপুকুর, রংপুর।
১১.	১০০.	মোসা. কায়েমা খাতুন, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১২.	১৪৮.	মোছা. নাজমিন নাহার, মিঠাপুকুর, রংপুর।
১৩.	০৬.	মোছা. আয়শা সিদ্দিকা (কলি), মিঠাপুকুর, রংপুর।
১৪.	১৫.	নিলুফা, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১৫.	৫৯.	সিরাজাম মুনিরা, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১৬.	০৯.	জাকিয়া সুলতানা জেসমিন, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।
১৭.	১৯.	মোছা. তানজিলা আক্তার, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।
১৮.	৩১.	মোসা. বিলকিস খাতুন, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১৯.	১১১.	মোসা. কামনুর নাহার, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
২০.	৬২.	মোছা. মেহেজাবিন আক্তার, মিঠাপুকুর, রংপুর।
২১.	৬৫.	মোছা. মারফি, মিঠাপুকুর, রংপুর।
২২.	১২১.	মোসা. মাসুমা আকতার, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
২৩.	১৩৩.	মমিনা খাতুন, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট।
২৪.	৩৯.	মোসা. সুমাইয়া মিম, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।
২৫.	১২৪.	মোছা. খাদিজা তুল কোবরা, মিঠাপুকুর, রংপুর।
২৬.	১৪৪.	মোসা. সুলতানা খাতুন, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
২৭.	০৩.	মোছা. ফাতেমা খাতুন, মিঠাপুকুর, রংপুর।
২৮.	২৮.	মীর মারিয়া মেহজাবিন মিতি, ঝিকরগাছা, যশোর।
২৯.	৮৭.	মোছা. ফারিহা আক্তার, পীরগঞ্জ, রংপুর।
৩০.	৯৬.	বর্ণা বারোয়ার, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
৩১.	১২৮.	মোছা. শামসুন্নাহার খাতুন, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
৩২.	১৩৮.	মোছা. হামিমা আরা, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।

ক্রমিক	ফরম নং	ছাত্রদের তালিকা
১.	৬৮.	মো. আরিফুজ্জামান, মিঠাপুকুর, রংপুর।
২.	৭০.	মো. শাহাবুল ইসলাম পায়েল, মিঠাপুকুর, রংপুর।
৩.	৪৬.	মো. মেহেদী হাসান, মিঠাপুকুর, রংপুর।
৪.	১১৩.	মীর রাইসুল ইসলাম, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট।
৫.	১৪২.	মো. মিজানুর রহমান, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।
৬.	০১.	মো. আমিনুল হক, সিংড়া, নাটোর।
৭.	৬৩.	মো. বায়জিদ মিয়া, মিঠাপুকুর, রংপুর।
৮.	০৭.	মো. শিবলী নোমান সরকার, দাকোপ, খুলনা।
৯.	৩২.	মো. মাহ্ফুজ হাসান (মিতুল), মিঠাপুকুর, রংপুর।
১০.	৬৪.	মো. মুহিদ হাসান, মিঠাপুকুর, রংপুর।
১১.	১০.	মো. জসিম উদ্দিন, সিংড়া, নাটোর।
১২.	১২.	মো. রাব্বি হাসান, সিংড়া, নাটোর।
১৩.	৬৭.	মো. সুরুজ মিয়া, মিঠাপুকুর, রংপুর।
১৪.	৬৯.	মো. স্বাধীন মিয়া, মিঠাপুকুর, রংপুর।
১৫.	৭১.	মো. আফতাবুর জামান, মিঠাপুকুর, রংপুর।
১৬.	৮২.	মো. জুবায়ের বাহাদুর, নাজিরপুর, পিরোজপুর।
১৭.	১২০.	মো. নাদিম আলী, গোমস্তাপুর, চাপাইনাবাবগঞ্জ।
১৮.	১১.	মো. তুষার উদ্দিন, সিংড়া, নাটোর।
১৯.	৫৪.	মো. গোলাম সাকলায়েন, মিঠাপুকুর, রংপুর।
২০.	০৪.	মো. বায়জেদ রুস্তাকি রাকিব, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।
২১.	৮৩.	মো. সিহাব আলী, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
২২.	১১৫.	মোজাহিদ আলী, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
২৩.	১১৬.	মো. সজল মিয়া, জামালপুর সদর, জামালপুর।
২৪.	১৩৬.	ফিরোজ আহমেদ, মিঠাপুকুর, রংপুর।
২৫.	৩৩.	মো. জাকারিয়া হোসেন, মিঠাপুকুর, রংপুর।
২৬.	৫৫.	খন্দকার ইমতিয়াজ হাসান ইমন, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
২৭.	৭২.	মো. সাব্বির হোসেন, জামালপুর সদর, জামালপুর।
২৮.	৭৬.	মো. আসাদুল হক, জামালপুর সদর, জামালপুর।
২৯.	৭৯.	মো. শাহেদ আলী, জামালপুর সদর, জামালপুর।
৩০.	১০৫.	মো. ইসতিয়াক আহমেদ,গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
৩১.	১৪৫.	খালেদ হাসান সালাম, বরুড়া,কুমিল্লা।

প্রকল্প সংবাদ

অভিনন্দন!!

প্রকল্পের ২০০৫ এইচএসসি ব্যাচের সদস্য এস. এম. মাহমুদুল হাসান সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। উল্লেখ্য, তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ থেকে ২০০৯ সালে সিজিপিএ ৩.৮১ সহ স্নাতক (সম্মান) এবং একই বিভাগ থেকে ২০১০ সালে সিজিপিএ ৪.০০ সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেন। তিনি গাংনী সেকেন্ডারী স্কুল, মেহেরপুরথেকে ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৪.৪৪ এবং ২০০৫ সালে নিউ গভ: ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫.০০ সহ এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনের শুরুতে মাহমুদুল হাসান ২০১২ সালে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। জাপান সরকারের অর্থায়নে MEXT Scholarship এর আওতায় ২০১৫ সালে তিনি জাপানের সাইতামা ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হন। পিএইচডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ জমা শেষে দেশে ফিরে তিনি ২০১৯ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। তাঁর এই অসাধারণ সাফল্যে আমরা গর্বিত। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন!! আমরা তাঁর জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

অভিনন্দন!!

প্রকল্পের ২০০৫ (এইচএসসি) ব্যাচের সদস্য মিঠুন দেবনাথ ৩৯তম বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দাকোপ, খুলনা-তে মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন। তিনি ইতিপূর্বে খুলনা মেডিকেল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এমবিবিএস সম্পন্ন করেন। মিঠুন দেবনাথ নয়াহাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রুপসা, খুলনা থেকে ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৪.৬৯ এবং ২০০৫ সালে সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫.০০ সহ এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

তার এই অর্জনে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন!! আমরা তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

অভিনন্দন!!

প্রকল্পের ২০০৮ ব্যাচের সদস্য মো. নকিবুল হাসান ৩৯তম বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পীরগঞ্জ, রংপুর-এ মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন। তিনি ইতিপূর্বে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে বিডিএস সম্পন্ন করেন। নকিবুলশঠিবাড়ী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৫ এবং ২০১০ সালে রংপুর সরকারি কলেজ, রংপুর থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫.০০ সহ এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

তার এই অর্জনে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন!! আমরা তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

ফাউন্ডেশন সংবাদ

আমরা শোকাহত

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক জনাব মোবারক হোসেন খান গত ২৪ নভেম্বর, শনিবার দিবাগত রাতে ঢাকাস্থ নিজ বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহী রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগীত গবেষক ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক জনাব মোবারক হোসেন খান ২০০১ সালের মার্চ মাস থেকে জুন ২০০৪ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রায় তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে ভূমিকা রেখে গেছেন তা আমরা সব সময় কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করব।

আমরা মহান স্রষ্টার কাছে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং সেই সাথে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

প্রকল্প সংবাদ

মেধা লালন প্রকল্পের ২০১৬ ব্যাচের সদস্য মো. মানিক মিয়া গত ০৭/০৮/১৯ তারিখে লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার দীঘিরহাট সড়কে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছে (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মানিক মিয়া হাতীবান্ধা উপজেলার সিঙ্গিমারী ইউনিয়ন নিবাসী মো. নজরুল ইসলাম ও মোছা. আনোয়ারা বেগমের পুত্র। সে কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি বিভাগে ৩য় বর্ষে অধ্যয়ন করছিল। মেধা লালন প্রকল্প'র একজন মেধাবী সদস্যের এই অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা সবাই তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং সেই সাথে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

'চিঠিপত্র' বিভাগ প্রসঙ্গে

প্রিয় সদস্যবৃন্দ, শুভেচ্ছা নিও। নবীন এর গত সংখ্যার প্রকল্প সংবাদে আমরা জানিয়েছিলাম যে, আগামী সংখ্যা থেকে 'চিঠিপত্র' শিরোনামে পত্রিকায় একটি বিভাগ পুনরায় চালু হতে যাচ্ছে যেখানে পত্রিকাটির ভালো দিক, মন্দ দিক সহ বিভিন্ন বিষয়ে তোমাদের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক মতামত ছাপানো হবে। পত্রিকাটিকে আরও আকর্ষণীয় ও অর্থবহ করে তোলার এই উদ্যোগকে সফল করতে আমরা তোমাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আশা করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, এ বিষয়ে তোমাদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। মাত্র অল্প কয়েকজন সদস্য তাদের মতামত জানিয়েছে যাও যথেষ্ট মানসম্মত বলে আমাদের মনে হয়নি। তাই আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উক্ত বিভাগটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। 'চিঠিপত্র' বিভাগে ছাপানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ লেখা তোমাদের কাছ থেকে নিয়মিত পেলে ভবিষ্যতে এ বিভাগটি পুনরায় চালু করা সম্ভবপর হতে পারে।

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১৬ (ছাত্র)

ক্রমিক	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১.	মো. হাসিবুল ইসলাম ১২৩৫/২০১৬ মনিরামপুর, যশোর।	মেকানিকাল টেকনোলজি, ৪র্থ বর্ষ যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, যশোর।
২.	মো. সিজান শেখ ১২৩৬/২০১৬ পাবনা সদর, পাবনা।	রসায়ন, ১ম বর্ষ ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ, পাবনা।
৩.	মো. সাদিকুল ইসলাম ১২৩৯/২০১৬ মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।	মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ১ম বর্ষ বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম।
৪.	মো. শাওন সরদার ১২৪০/২০১৬ গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।	ফিন্যান্স, ১ম বর্ষ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৫.	মো. ফরিদুল ইসলাম ১২৪১/২০১৬ মতিহার, রাজশাহী।	ক্রপ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ১ম বর্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৬.	মো. ওয়ালিদ মিয়া /২০১৬ মিঠাপুকুর, রংপুর।	কেমিক্যাল এন্ড ফুড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং, ১ম বর্ষ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
৭.	মুসা ফারুকী ১২৪৪/২০১৬ উলিপুর, কুড়িগ্রাম।	মার্কেটিং, ১ম বর্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৮.	মো. মোস্তাফিজুর রহমান ১২৪৫/২০১৬ সিংড়া, নাটোর।	পদার্থ বিজ্ঞান, ১ম বর্ষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর।
৯.	মো. আরিফুল ইসলাম ১২৪৯/২০১৬ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	মার্কেটিং, ২য় বর্ষ কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।
১০.	মো. জান্নাতুল ফেরদৌস ১২৫৪/২০১৬ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	কম্পিউটার টেকনোলজি, ৪র্থ বর্ষ রংপুর পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট, রংপুর।
১১.	মো. রাশেদ মোশারফ ১২৫৬/২০১৬ ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।	ইতিহাস, ১ম বর্ষ আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।
১২.	মো. আরমান বাহাদুর ১২৫৭/২০১৬ নেছারাবাদ, পিরোজপুর।	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
১৩.	মো. মুন্না মন্ডল ১২৫৮/২০১৬ বাসাইল, টাঙ্গাইল।	ফার্মেসী, ১ম বর্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১৪.	মো. আব্দুল হালিম ১২৬০/২০১৬ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	কম্পিউটার টেকনোলজি, ৪র্থ বর্ষ রংপুর পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট, রংপুর।
১৫.	মো. সহিদুল ইসলাম (সাহিদ) ১২৬১/২০১৬ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	সিভিল টেকনোলজি, ৪র্থ বর্ষ রংপুর পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট, রংপুর।
১৬.	মো. রাকিব হোসেন ১২৬২/২০১৬ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	আইন, ১ম বর্ষ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
১৭.	মো. আবু সাঈদ ১২৬৩/২০১৬ গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি, ৪র্থ বর্ষ রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।
১৮.	মো. নুর আলম ১২৬৫/২০১৬ হরিপুর, ঠাকুর গাঁও	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ১ম বর্ষ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

মাথায় কত প্রশ্ন আসে

বাসে উঠলে অনেকের বমি হয় কেন?

বাসে উঠলে বা লং জার্নি করলে অনেকেরই বমি হয়। একে বলা হয় 'মোশন সিকনেস'। 'মোশন সিকনেস' মূলত মস্তিস্কের একধরনের সমস্যা। বিশেষ করে বাস, প্রাইভেটকার বা এ জাতীয় বাহনগুলিতে জার্নি করার সময় এ সমস্যা হয়ে থাকে। শরীরের অন্তঃকর্ণ আমাদের শরীরের গতি ও জড়তার ভারসাম্য রক্ষা করে। আমরা যখন গাড়িতে চড়ি তখন অন্তঃকর্ণ আমাদের মস্তিস্কে খবর পাঠায় যে সে গতিশীল। কিন্তু চোখ বলে ভিন্ন কথা। কারণ তার সামনের বা পাশের মানুষগুলো কিংবা গাড়ির সিটগুলো তো স্থির। চোখ আর অন্তঃকর্ণের এই সমন্বয়হীনতার ফলে তৈরি হয় মোশন সিকনেস। মোশন সিকনেসে বমির ভাব হয় বেশি। সেই সাথে মাথা ঘোরা, মাথাধরা প্রভৃতি সমস্যা হয়ে থাকে।

মানুষের মন কি এবং মন থাকে কোথায়?

মন দর্শনশাস্ত্রের একটি অন্যতম কেন্দ্রীয় ধারণা। মন বলতে সাধারণভাবে বোঝায় যে, বুদ্ধি এবং বিবেক বোধের এক সমষ্টিগত রূপ যা চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ, ইচ্ছা এবং কল্পনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মন কি এবং কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে অনেক রকম তত্ত্ব প্রচলিত আছে। এসব তত্ত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে মূলত প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের সময় কাল থেকে। জড়বাদী দার্শনিকগণ মনে করেন যে, মানুষের মনের প্রবৃত্তির কোনোকিছুই শরীর থেকে ভিন্ন নয়। বরং মানুষের মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভুত শরীরবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মন গড়ে উঠে। মনের সঠিক সংজ্ঞা সম্ভব নয়। তবে এই ভাবে বলা যেতে পারে, মন হলো এমন কিছু যা নিজের অবস্থা এবং ক্রিয়াগুলি সম্পর্কে সচেতন। মনের স্বরূপ লক্ষণ হলো চেতনা যার থেকে মনকে জড়ো থেকে আলাদা করা হয়। সাধারণত মনকে তিনটি ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা হয় এক, মন বলতে চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা–এই মানসিক কাজগুলোর সমষ্টিগত রূপ বোঝায়। দুই, মন বলতে চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা–এই মানসিক কাজগুলি থেকে স্বতন্ত্র দেহাতিরিক্ত এক স্থান, অপরিবর্তিত আধ্যাত্ম সত্তাকে বুঝায়। তিন, মন বলতে বোঝায় এক মূর্ত আধ্যাত্মিক ঐক্যের সম্বন্ধ যা চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়, অথচ যা নিজের স্বাতন্ত্র না হারিয়ে এই সকল মানসিক কাজের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। প্রথমটি হলো মনের অভিজ্ঞতামূলক মতবাদ, পরেরটা আধ্যাত্মিক-মতবাদ, শেষেরটা ভাববাদীদের মতবাদ। মন ও চেতনা এক নয়। যদিও চেতনা হলো মনের স্বরূপ লক্ষণ।

রেললাইনের নিচে পাথর দেওয়া হয় কেন?

প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে কিংবা রেললাইন পেরোতে গিয়ে আমরা সবাই লক্ষ করেছি দুটো লাইনের মধ্যে অসংখ্য পাথরটুকরো ফেলা থাকে। কেবল লাইনের মধ্যেই নয়, রেললাইনটাই এই পাথরটুকরোর বিছানার ওপর পাতা রয়েছে। খেয়াল করেছি সবাই, কিন্তু ভেবে দেখেছি কি এই পাথরটুকরো কেন ফেলা থাকে রেললাইনে?

রেললাইনের নিচে পাথর দেওয়া হয় মূলত তিনটি কারণে। প্রথমত ওই মাইলের পর মাইল বিস্তৃত লম্বা ধাতব রেললাইন যেটা খোলা আকাশের তলায় সারাজীবন পড়ে থাকে ঝড় জল-গরম-ঠান্ডা সব সামলে তাকে অত্যধিক গরমে আয়তনে বাড়তে এবং অত্যধিক ঠান্ডায় আয়তনে কমতে দিলে চলবে না কোনোমতেই। দ্বিতীয়ত বিশাল দান বা কৃতি ট্রেনগুলো লাইনের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় মাটিতে এমন কম্পন শুরু হয় যে ওই লাইন তার জায়গা থেকে সরে যেতে পারে এবং এই সরে যাওয়া এক চুল হলেও ট্রেনের পক্ষে ভয়ংকর বিপদ। সুতরাং কম্পনেও রেললাইনকে স্থানচ্যুত করতে দেওয়া যাবে না কোনোমতেই। তৃতীয়ত তুষারপাত, কুয়াশা, বৃষ্টি, ঝড় ইত্যাদির ফলে রেললাইনগুলো যে মাটির ওপর লাগানো সেই মাটিতে জল সেচনের ফলে আগাছা জন্মানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়। আর আমরা জানি একবার আগাছা জন্মাতে দিলে রেললাইনের অধিকাংশই তাদের দখলে চলে যাবে ফলে রেল চলাচল কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে। সুতরাং আগাছা জন্মাতে দেওয়া যাবে না। এইসব কারণকে মাথায় রেখে নিরবচ্ছিন্নভাবে ট্রেন চালাতে রেললাইনের নিচে পাথর দেওয়া হয়।